মাতা ও পুত্র।

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার, এম্, এ, প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৬ নং রঘুনাথ চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, "মুকুল" আফিস হইতে প্রকাশিত।

সন ১৩১৬ সাল।

মূল্য চারি আনা।

কলিকাতা।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

মাতৃভক্ত পুত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিজয়ার বিদায়।

আজ বিজয়ার সন্ধ্যাকাল। গৃহে গৃহে আনন্দ-প্রবাহ ছুটিয়াছে। আকাশে অর্দ্ধচন্দ্রের উদয় হইয়াছে; আকাশ ও পৃথিবী এক মধুর অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিতে প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। বসন্তের চাঁদের শোভা অন্য সকল মাসের অপেক্ষা সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু শরতের সঙ্গে যে মধুর স্মৃতি জড়িত থাকে, বসন্ত তাহা কোথায় পাইবে? অন্ততঃ বঙ্গদেশে শরতের আশ্বিনমাস চিরদিনই মধু হইতে মধুরতর মাস বলিয়া বিখ্যাত থাকিবে। স্কুলের ছেলেরা পূজার এক মাস পূর্ব্ব হইতে দিন গণিতে আরম্ভ করিয়াছিল; টেবিলের সম্মুখে যেখানে

পড়িতে বসে, সেইখানে দেওয়ালের গায়ে ত্রিশটি দাগ দিয়াছে ; একটী করিয়া দিন যায়, আর একটি করিয়া দাগ মুছিয়া ফেলিতেছিল। উনত্রিশ দিন, আটাশ দিন, সাতাশ দিন,—দিন গুলি যেন আর ফুরাইতে চাহে না। দেশে যাইতে হইবে। পল্লীগ্রামে যে সকল সঙ্গীদিগকে রাখিয়া আসিয়াছে, যাহাদের ভাগ্যে সহরে আসিয়া পড়া ঘটিয়া উঠে না, তাহাদের কাছে ত আর সেই আগেকার হরি, মন্মথ, শশধর ফিরিয়া যাওয়া যায় না, এমন কিছু লইয়া যাইতে হইবে, যাহা দেশের লোক কখনও দেখে নাই। লোকে সেই সব দেখিয়াই বুঝিতে পারে যে, ইহারা সহরে পড়িয়া বাবু হইয়াছে। কেহ বা ফুল-কাটা রঙ্গীন স্মার্ট কিনিতেছে ; কেহ বা সুগন্ধ তৈল বা এসেন্স্ কিনিয়াছে ; কেহ বা লাল-নীল-আলো কিনিয়াছে। যে যাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, আজ তাহা দেখাইবার দিন। বিজয়া বাঙ্গালীর মহোৎসব। আজ বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলের মুখেই আনন্দ। রঙ্গরমণীগণ স্বামী, পুত্র, পিতা

ভ্রাতাদিগকে বিদেশে পাঠাইয়া পথ চাহিয়া বসিয়া ছিলেন; আজ তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। আজ তাঁহাদের হৃদয়ে আর কিছু নাই—কেবল আনন্দ ও ভালবাসা।

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া সকলে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে; তখনও বিলাতী বাজনা বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামে প্রবেশ করে নাই। আজ ঢোল কাঁসী যেন আপনাদের গৌরবে গর্ব্বান্বিত হইয়া পল্লীগ্রামের আকাশ কাঁপাইয়া তুলিতেছে।

বিজয়ার উৎসবের এই বিশেষত্ব যে, ইহার গভীর আনন্দের সঙ্গে একটী ক্ষীণ বিষাদের রাগিনী মিশ্রিত আছে। ইহা কি পার্ব্বতীর পিতৃগৃহ হইতে বিদায়ে সহানুভূতির জন্য, না সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী বাঙ্গালীর পুনঃ প্রবাসের স্মৃতি-জাত? সারা বৎসর যে পূজার মুখ চাহিয়াছিলে, তাহা ত ফুরাইয়া গেল। এখন ত আবার বাহির হইতে হইবে। যে কারণে

হউক, বিজয়ার সঙ্গে এক প্রকার সূক্ষ্ম বিষাদের রস মাখান আছে। সন্ধ্যাকালে বিসর্জ্জনের ঘাট হইতে ফিরিবার সময় এই বিষাদের ভাব ঘন হইয়া উঠে। আমাদের দেশের শানাই হৃদয়ের মর্ম্মস্থল আলোড়িত করিবার কি এক সন্ধান জানে। বিজয়ার সন্ধ্যাকালে শানাইয়ে যে বিষাদের সুর উঠে, আর কোথাও তেমনটি শুনি নাই। সন্ধ্যার পরে যত রাত্রি অধিক হইতে থাকে, ততই বিষাদের ক্ষীণ রেখা আবার মিশাইয়া যায়। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সকলে পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে বিজয়ার প্রণাম করিয়া প্রতিবাসী সকলকে অভি-বাদন করিতে বাহির হইলেন। আজ আর শত্রু মিত্র নাই, সকলেই প্রাণ খুলিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছেন। সর্ব্বত্র মিস্ট কথা, মিষ্ট ব্যবহার।

এমন করিয়া সন্ধ্যা কাটিয়া গিয়াছে, রাত্রি প্রায় এক প্রহরের অধিক হইয়া গিয়াছে। এখনও কেহ ফিরেন নাই। কিন্তু রামজয় বাবু সকালে সকালে ফিরিয়া প্রাঙ্গনে একখানি জল চৌকীর উপরে

বসিয়া আছেন। আমরা যে স্থানের কথা বলিতেছি, তাহা নদীয়া জেলার খড়িয়া নদীর তীরে একখানি নাতিক্ষুদ্র পল্লী। এখানে অনেকগুলি মধ্যবিত্ত লোকের বাস। গ্রামখানির অবস্থা এখন কিছু ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। রামজয় বাবু এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত লোক, বিদেশে চাকরী করেন। তিনি ফিরিয়া আসিতে না আসিতে বৃদ্ধা মাতা তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের উভয়ের মুখ বিষণ্ণ। মাতা আস্তে আস্তে বলিলেন, "রামজয়, আজ না গেলে কি কোন মতেই চলে না?" "না, মা, তাহা হইলে কি আজ তোমাদের ফেলিয়া যাই? মা, তোমাদের কাছে কি আর লুকাইব? আজ আমার মন যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; চিরদিনই ত বিদেশে থাকি, এমন ত কোনদিন হয় না। মা, যদি আর না ফিরি?"—মা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "যাট, আমার, ছি অমন কথা বলিতে নাই। তোমার শত বৎসর পরমায়ু হোক। তুমিত আবার কালীপূজার সময় আসিবে। কিছু ভেবোনা। মনিবের কাজ

আছে তা যেতে হবে বৈকি। এখন রাত্রি হইয়াছে ; আমি দেখি, বৌমা খাওয়ার আয়োজন করিতেছেন। তোমাকে ভোরে যেতে হবে, বেশী রাত করিয়া কাজ নাই।”

এই বলিয়া মা রান্না-ঘরের দিকে গেলেন। কিন্তু তাঁর মনে কি এক পাথরের বোঝা চাপিয়া রহিল। চোখে জল আসিয়াছিল বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। রামজয় বাবু সেখানেই বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলকমল পাড়া হইতে আসিল। নীলকমলকে সকলে কমল বলিয়া ডাকিত। রামজয় বাবু কমল বলিয়া ডাকিতেই সে বাবার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। রামজয় বাবু তাহাকে কেন যে ডাকিলেন, তিনি তাহা নিজেই জানেন না। কমল অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে বলিল, “বাবা”। রামজয় বাবুর চমক ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন,—

হাঁ, কমল, তোমাকে ডাকিতেছিলাম, আমি ত আজ রাত্রিতেই যাইতেছি। তোমার উপরেই সব

ভার। তুমি ছেলে মানুষ। তোমার বাবা তোমাদের কিছু করিতে পারিল না।" কমল পিতার কথা শুনিয়া চিন্তিত হইল, "বাবা, আপনি ও কথা কেন বলিতেছেন?" রামজয় বাবু তখন তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "না, কিছু নয়. আমি আজ যাব কিনা, তাই বলিতেছিলাম।"

এমন সময় আহারের ডাক পড়িল। পিতা পুত্র আহার করিতে গেলেন। আহারের সময় কেহ বড় কোন কথা বলিলেন না; সকলের মনের উপর কি এক বিষাদের ছায়া পড়িয়া গিয়াছে। সেই রাত্রির শেষেই রামজয় বাবু মায়ের পায়ের ধূলি লইয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

অকূল পাথার।

রামজয় বসু মহাশয় একজন মধ্যবিত্ত জমিদারের নায়েব। জমিদারটির আয় খুব বেশী না হইলেও জাঁক জমক যথেষ্ট আছে। নিকটবর্ত্তী আর একজন জমিদারের সঙ্গে তাঁহাদের বংশগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। সময়ে সময়ে উভয়পক্ষে তুমুল বিবাদও হইয়া গিয়াছে, ছোট ছোট কলহ, ও তাহার জন্য মোকদ্দমা ইত্যাদি ত লাগিয়াই আছে। এই সব মোকদ্দমার জন্য রামজয় বাবুকে অনেক সময় নদীয়া জেলার রাজধানী কৃষ্ণনগরে থাকিতে হয়। রামজয় বাবুর দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠ নীলকমলের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তাহার বয়স ষোল বৎসর; কনিষ্ঠ, নীলরতন তাহার বয়স বার বৎসর। রামজয় বাবু পুত্র দুইটিকে তাহাদের শিক্ষার জন্য কৃষ্ণনগরে নিজের কাছেই রাখেন। তিনি অতি উদার হৃদয় সৎপ্রকৃতির

লোক। কৃষ্ণনগরে তাঁহার বাসা প্রায় সর্ব্বদাই অতিথি-অভ্যাগতে পরিপূর্ণ। আত্মীয়-স্বজন ও দেশের লোক কাজ ও অকাজে কৃষ্ণনগরে আসিলেই তাঁহার বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেহ বা দুই মাস ধরিয়াই আছেন। রামজয় বাবুর নজরটা কিছু বড়; বাসায় প্রতিদিন আহারের বৃহৎ আয়োজন হয়। তিনি নিজে যাহা খান, বাসার সকলকেও তাহাই খাইতে দেন। শুধু তাই নয়, গ্রামের লোকেরা বা আত্মীয়-কুটুম্বেরা যখন থাকেন, তাঁহাদের কাপড়-চোপড়ের অভাব দেখিলে আবার নিজের টাকা দিয়া তাহা কিনিয়া দেন। তাঁহার নিকট কোনও জিনিস চাহিয়া কেহ কখনও নিরাশ হয় নাই। বাড়ীতে তাঁহার মাতা ও স্ত্রী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা সপরিবারে থাকেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথক বাড়ীতেই থাকেন, দেশে পৈতৃক সম্পত্তি আছে, তাহার কাজকর্ম্ম দেখেন। তাঁহারা দুই ভাই যে পৃথক হইয়াছিলেন, তাহা নয়; তবে রামজয় বাবু বিদেশে কাজ করেন, কাজের অবস্থাও মন্দ

নয়। মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন যে, পৈতৃক সম্পত্তি তাঁহার ভাই ই লউন, তিনি তাঁহাকে অর্থ-সাহায্যও করিতেন। রামজয় বাবু যদিও চিরকাল বিষয়কার্য্য লইয়াই আছেন, কিন্তু সংসারের মলিনতা ও কুটিলতার কোনও ধার ধারিতেন না।

তাঁহার চাকরীর অবস্থা মন্দ নয়; কিন্তু কৃষ্ণ-নগরের বাসার ও বাড়ীর—এই দুই স্থানের খরচ চালাইয়া উঠিতে অনেক সময়ই তাঁহার ঋণ হইয়া যাইত, তবু ইহার জন্য তিনি কখনও চিন্তিত হন নাই। তিনি নিজে সরল ও উদার-হৃদয় লোক, ভাবিয়াছিলেন এমনি করিয়াই দিন কাটিয়া যাইবে। কিন্তু সেদিন বিজয়ার সন্ধ্যাকালে তাঁহার মনে হঠাৎ এক প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইল, আমি যদি এখন মরিয়া যাই, আমার স্ত্রী পুত্রের কি হইবে? তাহাদের জন্য ত কিছুই রাখিয়া যাইতেছি না। অপরদিকে চারিদিকে যে সমুদায় ছোট ছোট ঋণ আছে, তাহাই বা কি করিয়া শোধ হইবে? এই সকল চিন্তা হৃদয়ে লইয়া তিনি

কৃষ্ণনগরে আসিলেন। সকলে তাঁহার মুখে এবার অস্বাভাবিক বিষাদের রেখা দেখিতে লাগিল। কৃষ্ণনগরে আসিবার তিন চারি দিন পরে একদিন ভোরে হঠাৎ তাঁহার ভেদ ও বমি হইতে লাগিল। প্রথম হইতেই তাঁহার মনে হইতেছিল যে, "এইবার বুঝি আমার যম আসিয়াছে।" রামচরণ নামে তাঁহার এক বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল; রামচরণকে তিনি শৈশবকাল হইতে মানুষ করিয়াছেন; তিনি তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন ও ভালবাসিতেন। সে সর্ব্বদাই কৃষ্ণনগরের বাসায় থাকিত। বাসায় সকল বন্দোবস্তের ভার তাহারই হাতে। রাত্রি প্রভাত হইতে হইতেই রামজয় বাবু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "চরণ, (রামচরণকে তিনি চরণ বলিয়া ডাকিতেন) আমার বুঝি দিন ফুরাইয়াছে; এ যাত্রা আমার রক্ষা নাই, তুমি শীঘ্র ঘাটে গিয়া একখানি পান্‌সী ভাড়া কর, আমি এখনই বাড়ী যাইব, যত ভাড়া লাগে তাহাই দিবে, কিন্তু শীঘ্র যেন বাড়ী পৌঁছিতে পারি।"

রামচরণ ঘাটে গিয়া একখানি ছয় দাঁড়ের পান্‌সী ঠিক করিয়া আসিল। ইতিমধ্যে ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল। ডাক্তার আসিয়া তাঁহার চোক, মুখ, ও নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইলেন। তিনি প্রথমে বাড়ী যাইতে দিতে আপত্তি করিলেন, পরে রামজয় বাবুর আগ্রহ দেখিয়া বেশী কিছু বলিলেন না; সঙ্গে কিছু ঔষধ দিয়া তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া দিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, রোগ সাংঘাতিক। রামচরণ ও আরও দুই জন ভৃত্য সঙ্গে চলিল। রামজয় বাবু নৌকায় উঠিয়া মাঝিকে বলিলেন, "মাঝি, যদি আমি বাঁচিয়া থাকিতে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে পারিস, তবে ভাল রকম বক্সীস দিব।"

মাঝি বলিল, "কর্ত্তা, বক্সীস লইয়া কি করিব! আমরা আপনার চিরদিনের চাকর; আপনাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া না দিয়া জলগ্রহণ করিব না।" তাহাদের কথা শুনিয়া রামজয় বাবুর চক্ষে জল আসিল। পৃথিবীতে যাহাদিগকে ছোট লোক বলে, অনেক

সময়ে তাহাদের সহৃদয়তা অনেক বড় ঘরে পাওয়া যায় না। ছয় জন দাঁড়ী দাঁড়ে বসিল। তাহারা প্রাণপণে দাঁড় টানিতে লাগিল, কিন্তু আশ্বিন মাসের নদী খর-টান। ওদিকে রোগও আগুনের ন্যায় দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া চলিল। বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে বুঝা গেল, আর বিলম্ব নাই। রামচরণ একবারও রোগীর পাশ হইতে নড়ে নাই। রামজয় বাবু তাহার মুখপানে একবার তাকাইয়া তাহার হাত দুইখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া বলিলেন, "চরণ, দেখ, আমার হাত দিয়া আগুন বাহির হইতেছে, একটু জল।" জল খাইয়া আবার বলিলেন, "চরণ, তোমার ঋণ কখনও শুধিতে পারিব না, কমল থাকিল তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য চলিয়াছিলাম, তাহা ত হইল না; তাহাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া চলিলাম। তাহাকে বলিও, আমাকে যেন ক্ষমা করে, আমি তাহার পিতা ছিলাম না, শত্রু ছিলাম। তাহাদিগকে পথের ভিখারী করিয়া যাইতেছি। তুমি কি আমাকে

কথা দিবে যে, তাহাকে কখনও ছাড়িয়া যাইবে না।"

রামচরণের চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছিল; তখন তাহার কি আর কথা বলিবার শক্তি আছে? অতি কষ্টে বলিল, আমি ত মাকে কখনও দেখি নাই, বাবাকেও মনে পড়ে না, আপনিই আমার সব ছিলেন। আমার যদি মানুষের রক্ত থাকে, তাহা হইলে কখনও আপনার নিমক ভুলিব না।"

রামজয় বাবু বলিলেন, "তবে হইয়াছে, আর ঔষধ দিও না; পরমেশ্বরের নাম কর। বাড়ী গিয়া মায়ের পদধূলি লইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিও।"

এই বলিয়া তিনি চক্ষু বন্ধ করিলেন। আর চক্ষু খুলিলেন না। নৌকার মাঝি দাঁড়ী সকলের চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নীরবে প্রাণ-বায়ু বাহির হইয়া গেল।

মাঝি যাহা বলিয়াছিল, তাহাই করিল। সমস্ত

দিন তাহারা জলগ্রহণ করিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে নৌকা ঘাটে লাগিল। রামচরণ কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া সকলে মৃতদেহ লইয়া ধরাধরি করিয়া বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইল। আস্তে আস্তে দ্বারে আঘাত করিতেই ভিতর হইতে রামজয় বাবুর মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ও ?" আজ কেন এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার ঘুম হয় নাই ? তিনি শয্যায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে ছিলেন। রামচরণ যাহা ভয় করিয়াছিল, তাহাই হইল। কিন্তু কি করিবে ? বলিল, "আমি রামচরণ।" বৃদ্ধা, "রামচরণ, খবর কি ?"—এই বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন। ইতিমধ্যে একজন ভৃত্য সাড়া পাইয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। তাহারা নীরবে মৃতদেহ লইয়া প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে রাখিল। বৃদ্ধা নামিয়া আসিয়া দেখিয়াই একবারে চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমুদায় গৃহ ক্রন্দনের রোলে পূর্ণ হইয়া গেল। কমল নিদ্রা হইতে উঠিয়া আসিয়া পিতার চরণতলে স্তম্ভিতের

ন্যায় বসিয়া পড়িল। তাহার মাতা শয্যা হইতে উঠিতেও পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে সমুদায় গ্রামের লোক আসিয়া জুটিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঋণ-মুক্ত।

কাল-রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই রামজয় বাবুর মৃত্যু সংবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। রাত্রিতে আত্মীয়-স্বজনেরা মিলিয়া, মৃত দেহ সৎকারের জন্য লইয়া গিয়াছিল। নীলকমল সঙ্গে গিয়াছে। প্রভাত হইবামাত্র বাড়ী লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সকলেরই মুখে বিলাপের ধ্বনি। কেহ বলিতেছে যে, একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গিয়াছে; কেহ বলিতেছে, এমন লোক আর হইবেনা; গরিব-কাঙ্গালের মা-বাপ ছিলেন। সকলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিস্তব্ধ হইয়াছে। স্বামীর মৃতদেহ যখন শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়, রামজয় বাবুর স্ত্রী [illegible] একবার স্বামীর

পদতলে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পর সকলে ধরাধরি করিয়া আবার তাঁহাকে শয্যায় লইয়া গিয়াছে। রামজয় বাবুর মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেও পারিতেছেন না। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিলে তাঁহার পক্ষে ভাল ছিল, কারণ রুদ্ধ শোকের উচ্ছ্বাস বুক ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। ক্রমে বেলা হইল। যে সব লোক দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা একে একে আপনাদের কাজে চলিয়া গেল। কিন্তু কতকগুলি লোক আর গেল না, বাহিরে বসিবার ঘরে বসিয়া রহিল।

নীলকমল বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় পিতার মৃতদেহ দাহ করিয়া ফিরিল। নীলকমলের খুল্লতাত, রামজয় বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামগোপাল বাবু শবের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়া বরাবর বাটীর ভিতর যাইতেছিলেন। এমন সময়ে যে সব লোক বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ডাকিয়া বলিলেন, "আপনারা এইদিকে একটু শুনিয়া যাইবেন।"

রামগোপাল বাবু ও নীলকমল দুই জনেই তাঁহাদের নিকটে আসিলেন। মৃত্যুর কারণ প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করার পরে তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক স্থূলোদর লোক বলিলেন, "তা যখন বলিতেই হইবে, আমিই বলি; কিছু মনে করিবেন না। আপনার দাদার নিকট ইঁহাদের কিছু পাওনা আছে; সেই জন্য ইঁহারা বসিয়া আছেন। আমিও কিছু পাব, বেশী নয়, তবে আমার টাকার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, তাই আসিয়াছি, নতুবা এমন সময় আসিতাম না, আমার টাকাগুলির একটা ব্যবস্থা করুন।" এই কথা শুনিয়া রামগোপাল বাবু বলিয়া উঠিলেন, "সে সব আমি জানি না, আমার সঙ্গে টাকাকড়ির কিছু সম্বন্ধ নাই।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। "তবে কি আমাদের টাকা মারা যাইবে? আমরা কি চোর? আমরা ঘরের টাকা ভাঙ্গিয়া দিয়াছি; টাকা না পাইলে যাইব না।" এইরূপ বলিয়া তাহারা সকলে গোলযোগ ও পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিতে

লাগিল। নীলকমল এতক্ষণ কিছু বলে নাই। তাহার হৃদয় শোকে পূর্ণ ছিল। সে কেবল তখন বাবার কথাই ভাবিতেছিল। সংসারের ভাবনা কোনও দিন তাহাকে ভাবিতে হয় নাই, সুতরাং সে তাহার কিছুই জানেনা ; কিন্তু হঠাৎ এই লোকগুলির এই ব্যবহার দেখিয়া তাহার হৃদয় ক্রোধ, অভিমান, দুঃখ ও ঘৃণাতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ তাহার খুড়া যেরূপ ভাবে আমি কিছুই জানি না বলিয়া চলিয়া গেলেন, সেইটা তাহার আরও অসহনীয় মনে হইল। ক্রোধ ও দুঃখে সে কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে তাহার পশ্চাৎ হইতে রামচরণ বলিয়া উঠিল, "তোমরা কি হিন্দু ? তোমাদের গায়ে যদি হিন্দুর চামড়া থাকিত, তাহা হইলে এমন দিনে আসিয়া টাকার জন্য এই ছোট ছেলেকে এমন করিয়া বলিতে পারিতে না। ইহার মুখ দেখিলে গাছ-পাথর গলিয়া যায়, আর তোমাদের মনে কিছু হইল না। টাকার বড় কি কিছু নাই ? আজ যদি কর্ত্তা বাঁচিয়া থাকিতেন, তাঁহা

হইলে বাড়ী আসিয়া টাকার জন্য অমনি করিয়া বলিতে তোদের সাধ্য হইত ? আমি ত সবই জানি। কর্ত্তা বেঁচে থাকিতে এসে হুজুর হুজুর করিতে, আর তিনি চোখ বুঁজিতে না বুঁজিতেই তোদের এই ব্যবহার।”

রামচরণের এই ঘৃণাপূর্ণ তীব্র ভৎর্সনায় লোক-গুলি ক্ষণকালের জন্য একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল ; তাহাদের অনেকেই মাথা হেঁট করিয়া রহিল। কিন্তু যাহারা চিরদিন টাকা টাকা করিয়া জীবন কাটাইয়াছে, টাকাই যাহাদের ধ্যান-জ্ঞান, তাহারা কি অত সহজে ভোলে ? দয়া-ধর্ম্মের কথা বেশীক্ষণের জন্য তাহাদের মনে স্থান পায় না। সর্ব্বদা টাকার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের মন কেমন এক প্রকার কঠোর ও অস্বাভাবিক হইয়া যায়। রামচরণের কথায় তাহাদের মনে একবার আঘাত লাগিলেও তাহা বেশীক্ষণের জন্য থাকিল না।

ইতিমধ্যে এই সংবাদ বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া বাড়ীর ভিতর হইতে রামজয়

বাবুর দুই ভগ্নীপতি ও আর কয়জন আত্মীয় বাহিরে আসিলেন। নিকটস্থ আর একটি গ্রামে ইঁহাদের বাড়ী; কথায় বলে, দুঃসংবাদের চারিটা পা। ইহারা প্রত্যুষেই সংবাদ পাইয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, বাড়ীর মধ্যে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন; এমন সময় একটি বালক গিয়া বলিল যে, টাকার জন্য লোকে নীলকমলকে অপমান করিতেছে। অমনি তাঁহারা বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ?"

তখন আবার পাওনাদারেরা গোলমাল আরম্ভ করিল। নীলকমলের পিসে মহাশয় বলিলেন, "যাও, তোমাদের টাকা কেহ ধারে না; কে তোমাদের টাকা লইয়াছিল ? তাহার কি প্রমাণ আছে ?" এই কথায় তাহাদের মুখ চূণ হইয়া গেল। বাস্তবিক তাহাদের পাওনা টাকার বিশেষ কোনও দলিল-দস্তাবেজ নাই। রামজয় বাবুর সঙ্গে তাহাদের দেনা-পাওনা ছিল; নানা উপায়ে তাঁহার নিকট হইতে বেশ দুপয়সা লাভ হইত

তাহারা যখনই টাকা চাহিয়াছে, পাইয়াছে; সুতরাং পাকা লেখা-পড়া ছিল না, আর ছিল না বলিয়াই তাহারা আজ এত ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে। তাহারা মনে মনে জানে যে, আদালতে দাঁড়াইলে, তাহাদের টাকা আদায় হওয়া দুষ্কর। সুতরাং রামজয় বাবুর আত্মীয়েরা যখন প্রমাণের কথা তুলিলেন, তখন তাহারা মুস্কিলে পড়িল। তখন তাহারা একটু নরম সুরে বলিল, "মহাশয়, রাগ করেন কেন, রামজয় বাবুর মৃত্যুতে কি আমাদের দুঃখ হয় নাই? রাগের কথা কিছু নয়। তবে কিনা আমাদের ন্যায্য পাওনা, আমরা কি মিথ্যা বলিয়া এই নাবালককে ফাঁকি দিতে আসিয়াছি?"

তাহারা এই প্রকার অনেক কথা বলিতে লাগিল। কিন্তু এবার শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি। তাহাদের নরম সুর দেখিয়া রামজয় বাবুর ভগ্নী-পতিরা বুঝিতে পারিলেন যে, টাকার কিছুই দলিল নাই। সুতরাং তাঁহারা আরও শক্ত হইলেন, —"কিসের টাকা" বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিলেন।

সেই স্থূলোদর প্রৌঢ় পাওনাদারের ত গলদঘর্ম্ম হইতে লাগিল। এমন সময়ে নীলকমলের ছোট ভাই আসিয়া তাহাকে বলিল, "মা তোমাকে ডাক্‌ছেন।" নীলকমল এতক্ষণ কিছু বলে নাই—চুপ করিয়া বসিয়াছিল। মা ডাকিতেছেন শুনিয়া নীলকমল দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনাদের কাহারও ভাবনা নাই, আমার বাবার যাহা ন্যায্য ঋণ আছে, তাহার এক পয়সাও বাকী থাকিবে না। দুঃখের কথা এই যে, আপনারা আমার পিতার নিকট হইতে চিরদিন অনুগ্রহ লাভ করিয়া আজ তাঁহার চিতার আগুন নিবিতে না নিবিতে আসিয়া আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিলেন। আপনারা ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি।"

এই কথা বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর গেল। তাহার কথায় পাওনাদারদের মস্তক আবার অবনত হইল। কিন্তু তাহার পিসেমহাশয় "কিসের পাওনা, কিসের টাকা, ও ছেলেমানুষ কিছু বোঝেনা" বলিতে লাগিলেন। নীলকমল বরাবর মায়ের কাছে চলিয়া.

গেল, মাতা-পুত্রে এই প্রথম সাক্ষাৎ। নীলকমলের মা পাওনাদারের কথা শুনিয়া শয্যা হইতে উঠিয়াছিলেন। এখন তাঁহার চক্ষুতে আর জল নাই; তাহার পরিবর্ত্তে এক আহত আত্মসম্মানের গর্ব্বিত তেজ দেখা যাইতেছিল। তবু নীলকমল আসিতেই আবার চক্ষে জল আসিল; নীলকমল গিয়া মায়ের বুকে মাথা রাখিল। ক্ষণকাল মাতা-পুত্রে নীরবে অশ্রুমোচন করিয়া, মাতা বলিলেন, "নীলকমল, এখন আর কাঁদিবার সময় নাই; বাহিরে যাহা হইয়াছে, আমি তাহা সব শুনিয়াছি; এই অলঙ্কার ও টাকা লও; যাহা পাওনা আছে, আজই সব মিটাইয়া দিতে হইবে; ইহার জন্য যদি আমাদের বৃক্ষতল আশ্রয় করিতে হয়, সেও ভাল।"

নীলকমল জননীর বক্ষ হইতে মস্তক তুলিয়া দেখিল যে, তাঁহার দীর্ঘ দেহ যেন আহত সম্মানের বেগে আরও দীর্ঘ হইয়াছে। তাঁহার মুখে সে তখন এমন এক গাম্ভীর্য্য দেখিল, যাহা পূর্ব্বে আর কখনও দেখে নাই। নীলকল বলিল, "মা, আমিও

ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে চাই, কিন্তু তোমার অলঙ্কারগুলি রাখিলে হয় না? আমাদের জমি ইত্যাদি যাহা আছে, সেই সব বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিস্কার করিয়া ফেলিব।”

ইতিমধ্যে নীলকমলের পিসা মহাশয় ও অপর আত্মীয়েরাও সেখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, “কিসের ঋণ? দলিল-পত্র নাই; উহার জন্য কিছুই করিতে হইবেনা। আর যদি কিছু করিতেই হয়, সে পরে দেখা যাইবে। এখন তাহার জন্য গায়ের অলঙ্কার দিতে হইবে না।” নীলকমলের মাতা ইহার উত্তরে বলিলেন, “আমার গাত্র হইতে এক একখানি অলঙ্কার খুলিতে আমার কি আনন্দ হইতেছে, তাহা আপনারা বুঝিবেন না। তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গ হইতে ইহা দেখিতেছেন এবং সন্তুষ্ট হইতেছেন। ইহা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি? আমার এক কপর্দ্দক সম্বল থাকিতে কেহ বলিতে পাইবেনা যে, তাঁহার ঋণ শোধ দেওয়া হয় নাই। আগে তাঁহার সকল ঋণের

ব্যবস্থা হইবে, তার পর আমি জলগ্রহণ করিব।”

নীলকমলেরও সেই মত; সে মায়ের নিকট হইতে অলঙ্কার ও টাকাগুলি লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, “আসুন, আপনাদের কত পাওনা আমি সকলের ঋণ পরিস্কার করিয়া দিতেছি। এই টাকা ও অলঙ্কার আনিয়াছি, ইহাতে যদি না হয়, আমাদের যে বাগান, জমি ইত্যাদি আছে, সে সমুদায় বিক্রয় করিয়া দিব।” পাওনাদারেরা বালকের সাধুতা ও তেজ দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল, তাহাদেরও রক্ত-মাংসের হৃদয়। তাহারা বলিল, “আমরা টাকার সুদ কিছুই লইব না; আসল টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট হইব।” তখন তাহাদের হিসাব হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

শ্রাদ্ধ।

মানুষের চরিত্র যদি নদীর জলের মত একটানা হইত, তাহা হইলে জীবন এত কঠিন হইত না। কিন্তু তাহাও নয়। শুধু যে পৃথিবীতে নানা প্রকারের লোক আছে তাহা নয়; প্রত্যেক মানুষেরই চরিত্র যেন পাহাড়ী দেশের জমির ন্যায়। তাহার কোন কোন স্থান উচ্চ পর্ব্বতের আকার ধারণ করিয়া আকাশ স্পর্শ করিতে চাহিতেছে, আবার কোথাও গভীর খাদের মত নীচ। আমরা কখনও মহত্ত্বের উচ্চ শিখরে উঠি, আবার আর এক সময়ে এমন পড়িয়া যাই যে, মনে হয়, "এই কি সেই আমি ?" এক সময় মনের সবলতার অবস্থায় যে সংকল্প করি, অন্য সময়ে তাহা কত কঠিন !

নীলকমল আবেগের মুহূর্ত্তে বলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার পিতার ঋণের এক পয়সাও বাকী থাকিবে..

না ; কিন্তু সেই সংকল্প যখন কাজে পরিণত করিতে গেল, তখন দেখিল যে, তাহা কত দুরূহ। সে ছেলেমানুষ, বিষয়কর্ম্ম কিছু বুঝিত না ; এখন সকলই বুঝিতে হইবে। তাহার খুড়ার উচিত ছিল যে, এ সময় নিজে সমস্ত ভার স্কন্ধে লইয়া তাহাকে সংসারের সকল ঝঞ্চাটের হাত হইতে নিষ্কৃতি দেন। কিন্তু পাছে গোলমালের মধ্যে পড়িতে হয়, সেই ভয়ে রামগোপাল বাবু আর সেই দিকে পদার্পণ করিলেন না। নীলকমলও বড় অভিমানী, খুড়া মহাশয়ের এই ব্যবহার দেখিয়া সেও বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু বলিত না। এই অকূল পাথারে তাহার মাতাই তাহার সহায় ও সাহস। নীলকমলের-মন যখন ভাঙ্গিয়া পড়িত, তখন তাহার মাতা তাহাকে সাহস দিতেন—মাতা ও পুত্রে বসিয়া অনেক সময়ে পরামর্শ করিতেন।

কিন্তু তাঁহারা কোনরূপেই এই অকূল পাথারে কূল দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা একেবারেই নিঃসম্বল হইয়া

পড়িয়াছেন। রামজয় বাবু স্থায়ী আয়ের কোন ব্যবস্থাই রাখেন নাই; তাঁহার চাকরীর বেতনই পরিবারের একমাত্র আয় ছিল। এখন তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহাদের আয়ের সকল পথ বন্ধ হইল। বিষয়-সম্পত্তি বলিতে বাড়ীতে পৈত্রিক জমি, বাগান ইত্যাদি যাহা কিছু ছিল, তাহাও আবার সুবন্দোবস্তে নাই। রামজয় বাবু কখনও এদিকে মন দেন নাই। চাকরীর আয়েই তাঁহার সংসার সুখে চলিয়া যাইত, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার কখনও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। চাকুরে লোকের সাধারণতঃ যাহা হয়, তাঁহারও তাহাই হইয়াছিল; মাসের বেতন পাইলেই মাসের মধ্যেই তাহা খরচ হইয়া যাইত, মাসের শেষে প্রায় রিক্ত-হস্ত হইয়া পড়িতেন; আবার বেতন পাইলে তবে খরচ চলিত। তিনি নীলকমলের মাকে কখনও বেশী কিছু দেন নাই। বিবাহের সময়ে তিনি যাহা কিছু অলঙ্কার পাইয়াছিলেন তাহাই সম্বল; তাহার পর সময়ে সময়ে ২।৪ টাকা যাহা কিছু পাইতেন তাহা সংগ্রহ করিয়া

রাখিয়াছিলেন ; গ্রামের লোকদিগকে তাহাদের প্রয়োজনমত ধার দিতেন, তাহার সুদেও কিছু টাকা হইয়াছিল।

আস্তে আস্তে এইরূপ করিয়া তাহার মাতার যাহা কিছু টাকা হইয়াছিল, নীলকমল সেদিন সমস্ত তাহা পাওনাদারদিগের ঋণ পরিশোধের জন্য দিয়াছেন,—এখন তিনি কপর্দ্দক-শূন্য।

দুই একটি করিয়া দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। এখন তাঁহাদের প্রধান ভাবনা, কিরূপে রামজয় বাবুর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এত বড় লোক ছিলেন তাঁহার শ্রাদ্ধ যে কিছু হইবে না, একথা কেহই মনে স্থান দিতে পারিলেন না। রামজয় বাবুর বৃদ্ধা মাতা জ্যেষ্ঠ পুত্রের শোকে শয্যাশায়ী হইয়াছেন ; তাঁহার অদৃষ্টে শেষ দশায় এই নিদারুণ শোক ছিল। তাঁহার শেষ সাধ যে, ধার্ম্মিক পুত্রের শ্রাদ্ধে দশ জন ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও গরীবকাঙ্গালীকে খাওয়ান হয়, কিন্তু গৃহের অবস্থা ত তিনি জানেন। কনিষ্ঠ পুত্র রামগোপাল এ সকল বিষয়ে মন দেন

সঙ্গে সংগ্রাম করিব বলিয়া মনে এক প্রকার সাহস আসে। যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন সৈনিকদিগের একটি যুদ্ধের মাদকতা আসে, তেমনি প্রতিকূল অবস্থার প্রথম আবর্ত্তনে আমাদের মনে এক প্রকার সাহস আসে। কিন্তু যখন তাহার নূতনত্ব চলিয়া যায়, যখন দিনের পর দিন দারিদ্র্য নূতন নূতন বিভীষিকা লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন সে সাহস চলিয়া যায়। প্রথম প্রথম অনেকে, কাজে না হউক, মুখে সহানুভূতি করিয়া থাকেন। কয়েকদিন পরে সকলে আপন আপন সুখ-দুঃখের বোঝা বহিতে যে যাহার স্থানে চলিয়া যায়, তাহার পর যখন একাকী নিত্য নূতন অভাব ও অপমান আলিঙ্গন করিতে হয়, তখন অতি বড় বীর হৃদয়ও দমিয়া যায়।

এতদিনে রামজয় বাবুর পরিবারে আসল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, শোক-দুঃখ ত আছেই, তাহার পর এখন ভাবিতে হইবে, পরিবারের ব্যয় চলিবে কি প্রকারে। যদিও কেহ কাহাকেও কিছু বলিতে-ছেন না কিন্তু নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই চিন্তাই সকলের

মনের উপর পাথরের মত চাপিয়া রহিয়াছে। এমন করিয়া থাকিলে ত চলিবে না। সময় কাহারও মুখ প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না। তোমার গৃহে শোক বলিয়া কিছু চন্দ্র-সূর্য্যের গতি বন্ধ থাকিবে না। পূজার ছুটী কোন দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। যদি পিতার মৃত্যু না হইত, নীলকমল এতদিনে স্কুলে চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন তাহার পড়া চলিবে কি না তারও ত কিছু ঠিক নাই। এমন অনিশ্চিত অবস্থায় আর বসিয়া থাকিলে চলিতেছে না। নীলকমল আপন মনে অনেক ভাবিয়াছে। তার বড় ইচ্ছা যে, আরও কিছু দিন পড়ে, কিন্তু তাহা কি করিয়া হয়? তাহার পড়ার খরচই বা কে দেয়, সংসারের খরচই বা কি করিয়া চলে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নীলকমল পাঠের আশা ত্যাগ করিল, আর পড়িতে পাইবে না একথা মনে করিতেও আপনার অজ্ঞাতসারে তাহার একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল; কিন্তু নীলকমল তাহার মন বাঁধিয়াছে। তাহার আর পড়া হইবে না, সে এখন কোথাও

চাকরীর চেষ্টা করিবে, যাহা কিছু পায় তাহার দ্বারা পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে এবং যদি সম্ভব হয়, নীলরত্নকে পড়াইবে।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে নীলকমল বারান্দায় তাহার মা যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। মাতা ও পুত্র উভয়েই অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিলেন; শেষে নীলকমল বলিল; "মা, আর ত বসিয়া থাকিলে চলিতেছেনা; এখন একটা কিছু দেখিয়া লইতে হইবে। আমি ঠিক করিয়াছি যে, কোথাও একটি চাকরী যোগাড় করিয়া লইব, তুমি বলিলেই এখন বাহির হই।"

নীলকমলের মাতা যে সে বিষয়ে ভাবেন নাই, এমন নহে; তিনিও কয়দিন ধরিয়া এই কথাই মনের মধ্যে তোলপাড় করিতেছেন, তবে তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন যে, যেমন করিয়াই হউক নীলকমলকে আরও কিছু দিন পড়াইতে হইবে কিন্তু কি করিয়া যে তাহার পড়া চলিবে, তিনি তাহা

কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজের হাতে যাহা কিছু টাকা ও অলঙ্কার ছিল, তাহা সব পূর্ব্বেই গিয়াছে, এখন তিনি আর কোন পথ দেখিতে পাইতেছেন না। নীলকমলের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "না কমল, এখন তোমার পড়া বন্ধ হইতে পারে না, যেরূপেই হউক, অন্ততঃ আরও কিছু দিন তোমাকে পড়িতে হইবে। আর তুমি এখন নিতান্ত ছেলেমানুষ, কে তোমাকে চাকরী দিবে? চাকরী লইলেও সে অতি সামান্য চাকরী হইবে; এখন চাকরী করিতে গেলে তোমার ভবিষ্যতের আশা একেবারেই মাটী হইয়া যায়।"

নীলকমলের মাতা এই বলিতেই তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল, "আমিও তাই বলি।" এই কথা শুনিয়া তাঁহারা উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। সন্ধ্যার আঁধারে তাঁহাদের পাশে যে আর একজন লোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা তাঁহারা একেবারেই টের পান নাই। সে আর কেহ নয়,—রামচরণ। রামচরণকে দেখিয়া নীলকমল বলিল, "ওঃ চরণ দা,

তুমিও তাই বল ! কিন্তু তুমি বুঝিতেছনা যে তাহা হইবার নয়। অসম্ভব কথা বলিলে চলিবে না। আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি যে, এখন আমার চাকরী করা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। আর এক কথা,—তুমি আর আমাদের সঙ্গে থাকিয়া কষ্ট পাও কেন ? আমি বলি, তুমিও এখন আর কোথাও চাকরী দেখিয়া লও।”

নীলকমলের মা বলিলেন, “হাঁ কমল, তুমি এ সত্য কথাই বলিয়াছ। চরণকে পূর্ব্বেই এ কথা বলা আমার উচিত ছিল। চরণ, আমরা ত এখন আর তোমার মাহিনা দিতে পারিব না ; তুমি কেন আমাদের কাছে থাকিয়া আর কষ্ট পাও, তুমি যেখানে যাবে, সেখানেই লোকে আদর করিয়া লইবে। ভগবান আবার যদি কখনও দিন দেন, তবে আবার তোমায় আনিব।”

রামচরণ কিছু বলিতেছেনা, তাহার দুটি চোখ জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। নীলকমলের মায়ের কথা শেষ হইয়া গেলে সে বলিল, “মা, আমার জন্য

দুই মুঠ ভাত আর জুটিবে না? আমি অন্যত্র খাইয়া আপনাদের কাছে থাকিব। তাড়াইয়া দিলেও আমি কোথাও যাইব না।"

নীলকমলের মা বলিলেন, "চরণ, তুমি ভুল বুঝিও না, তোমার ভালর জন্যই বলিতেছিলাম। আমাদের কাছে থাকিলে ত তোমার কষ্ট বই সুখে দিন যাইবে না। তুমি বুঝিয়া দেখ।"

রামচরণ। আমি অনেক দিন বুঝিয়া দেখিয়াছি। কর্ত্তা রোগ-শয্যায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, নীলকমল থাকিল। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, যতদিন জীবন থাকিবে তাহাকে ছাড়িয়া যাইব না। আপনারা দূর করিয়া দিলেও আমি এখানে পড়িয়া থাকিব।

রামচরণের কথা শুনিয়া নীলকমল ও তাহার মায়ের চোখ দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল নীলকমলের মা বলিলেন, "চরণ, তোমার ঋণ শোধ হইবে না। কমল যদি মানুষ হয়, তবে চিরদিন তোমার গুণের কথা স্মরণ রাখিবে। আর তুমি

বলিতেছিলে যে, সে অন্ততঃ আরও কিছু দিন পড়ুক। তুমি বুদ্ধিমানের মতই বলিয়াছ, এখন কমলকে বুঝাও ত।"

নীলকমল। এতে ত আর বুঝাইবার কিছু নাই, আমি কি বুঝি না যে, আরও কিছু দিন পড়িতে পারিলে ভাল। পড়ার আশা ত্যাগ করিতে আমার যে কষ্ট হইয়াছে, তাহা আমিই জানি। যাহা হইবার নয়, তাহা আর ভাবিয়া কি হইবে।

রামচরণ বলিল, "আমি যাহা ভাবিয়াছি তা শোন ; আমি কৃষ্ণনগরে কোনস্থানে চাকরী করিব এবং তাহাতে যে টাকা পাইব, তাহাতে কোন রকমে তোমার পড়ার খরচ চলিবে। শেষে কোন রকম সুবিধা হইতে পারে, তুমিও জলপানী পাইতে পার, কর্ত্তার বন্ধুরাও কেহ সাহায্য করিতে পারেন।"

রামচরণের এই কথা শুনিয়া নীলকমলের প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; সে বলিল, "আমি একবার গোয়াড়ীতে গিয়া দাঁড়াইতে পারিলে পরে

সব বুঝিয়া লইব। আমার ২।৩ মাস সময় নষ্ট হইল, তবু এখনও খাটিয়া পড়িলে আমি বৃত্তি পাইব আশা করি। এই কয়টা মাস চালাইয়া লইতে পারিলে হয়। কিন্তু চরণ দা, বাড়ীর খরচ চলিবে কি প্রকারে ?”

নীলকমলের মা বলিলেন, “বাড়ীর ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না ; আমরা এখানে এক প্রকারে চালাইয়া লইব। এখন গোলায় কিছু ধান আছে, বাড়ীর জন্য আমি কিছু ভাবিতেছি না। চরণের পরামর্শই ঠিক ; তুমি চরণের টাকা ঋণ স্বরূপ লইবে, পরে চাকরী হইলে আগে তাহার টাকা দিবে।”

রামচরণ বলিল, “সে পরের কথা পরে হইবে। আমার মনে হয়, এখন শীঘ্র শীঘ্র কৃষ্ণনগর যাওয়া ভাল ; অনেক দিন হইল স্কুল খুলিয়াছে। তার পরে সেখানকার বাসার কিছু বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

সেই যুক্তিই ভাল বলিয়া স্থির হইল। তখন

যাওয়ার দিন স্থির ও তাহার জন্য যা কিছু যোগাড় প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। এবার যাওয়ার কি হইবে? নীলকমল সাহস করিয়া বলিল, "ওঃ! এতটুকু পথ আমি অক্লেশে হাঁটিয়া যাইতে পারিব। মার যেমন কথা! আমি ত আর ননীর পুতুল নই।"

কিন্তু মায়ের মন কি আর বুঝে? বিশেষতঃ একটু আধটু নয়, ষোল মাইল পথ হাঁটিতে হইবে। যাইবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে নীলকমলের মা রামচরণকে কত উপদেশ দিলেন, "পথে বসিতে বসিতে যাইও; এক টানে বেশী হাঁটিও না; মাঝে কোথাও বাজারে খাওয়া-দাওয়া করিও; এক বেলায় না পার দুই বেলায় যাইও।" রামচরণ তাঁহাকে অনেক আশ্বাস দিয়া বলিল, "আপনার কোনও ভাবনা নাই।" এই প্রকার কথবার্ত্তায় অনেক রাত্রি হইয়া গেল। সে রাত্রিতে তিন জনেই আনন্দে শয্যায় শয়ন করিলেন। কিন্তু নীলকমলের মায়ের চক্ষুতে একবারও নিদ্রা আসিল না। আজ তাঁহার

শোক যেন নূতন হইয়াছে। সাহসে বুক বাঁধিয়া ছেলেকে একাকী বিদেশে পাঠাইতেছেন বটে, কিন্তু চিন্তা ও দুঃখে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মনে মনে সকল দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, "বিদেশে বিভূমিতে তোমরা আমার দুধের বাছাকে দেখিও।" ভাবনার কারণ যথেষ্ট আছে; সে যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, এমন স্থানটি পর্য্যন্ত নাই। স্থির হইয়াছে যে, তাহারা প্রথমে গিয়া আপন বাসাতে উঠিবে। সেটি ভাড়ার বাড়ী; তাহার কয়েক মসের ভাড়া বাকী হইয়াছে। জিনিসপত্র যাহা কিছু আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া ভাড়া শোধ দিয়া বাড়ী ছাড়িয়া দিবে এবং এই কয়েক দিনের মধ্যে অন্যত্র থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইবে, তাহারা এই মনে স্থির করিয়াছে।

নীলকমলের মা অনেকক্ষণ শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া যখন দেখিলেন আর ঘুম হইল না, তখন উঠিয়া নীলকমল ও রামচরণের জন্য কিছু খাবার

ইত্যাদি বাঁধিয়া দিলেন, আঙ্গিনার মাঝখানে একটী মঙ্গল-ঘট স্থাপন করিলেন। সেখানে বসিয়া কতকক্ষণ সকল দেবতাকে ডাকিলেন। তখনও রাত্রি প্রভাত হইতে একটু বিলম্ব আছে। একটি প্রদীপ হাতে করিয়া আস্তে আস্তে নীলকমলের ঘরে গিয়া দেখিলেন, সে অকাতরে ঘুমাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল; ভাবিলেন কাল এতক্ষণ বাছা আমার কোথায় কোন অপরিচিত লোকের মধ্যে থাকিবে। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তখনও জাগাইবার প্রয়োজন নাই ভাবিয়া তিনি ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে নীলকমলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চোক মেলিয়াই "কে ও" বলিয়া উঠিল,—"মা তুমি কখন উঠিয়াছ ? যাবার সময় হইয়াছে নাকি ?"

মা বলিলেন "এখনও অল্প একটু রাত আছে; কিন্তু হাত মুখ ধুইতে ধুইতেই ফরসা হইয়া যাইবে। তুমি যখন উঠিয়াছ, তখন রামচরণকে ডাক; হাত মুখ ধুইয়া কাপড় চোপড় পড়িয়া লও।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে জাগিয়া উঠিলেন। নীলকমল ও রামচরণ হাত মুখ ধুইয়া কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইল। ওদিকে পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হইয়া উঠিল। নীলকমলের মা আবার রামচরণকে অনেক পরামর্শ দিলেন; বলিলেন, "চরণ, তোমাকে ভরসা করিয়াই কমলকে পাঠাইতেছি। আমাকে সর্ব্বদা সংবাদ দিও।" তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না; থাকিয়া থাকিয়া রুদ্ধশ্বাসে গলা বন্ধ হইয়া যাইতেছে, কথা বাহির হয় না; এটা ওটা সেটা কত বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতে লাগিলেন। তার পর পাখী ডাকিয়া উঠিল, তখন সকলে বলিলেন, "আর দেরী করিও না, এইবার যাত্রার সময় হইয়াছে।"

নীলকমলের মা তখন নীলকমলকে বলিলেন, "মঙ্গল-ঘটে প্রণাম কর।" নীলকমল ঘটে প্রণাম করিয়া মাকে প্রণাম করিয়া মায়ের পায়ের ধূলা মাথায় লইল; মাকে প্রণাম করিতে যাইয়া তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল; অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ

না ; এ বাড়ীর দিকে বড় আসেনও না। মাতা একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে ডাকাইয়া আনাইয়া বলিলেন, "শ্রাদ্ধের দিন নিকট হইতেছে, আর ত এমন করিয়া থাকিলে চলিবেনা, এখন যাহা হয়, আয়োজন করা উচিত।" রামগোপাল আস্তে আস্তে বলিলেন, "আয়োজন আর কি করা যাইবে, কোন উপায় ত দেখিতেছিনা। সামান্য কোনও রূপে পুরোহিত মহাশয়কে ডাকাইয়া ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। খুব হয় ত গ্রামের ব্রাহ্মণ কয় জনকে খাওয়ান হইতে পারে।" তাঁহার মাতা এই কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দেশ-জুড়ে নাম ছিল, তার শ্রাদ্ধ এমন করিয়া করবি, তোর জন্যই ত ফকির হইয়াছিল, বলিয়া তিনি রামগোপালকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি সুবিধা নয় দেখিয়া আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলেন। তখন নীলকমলের মা আসিয়া শাশুড়ীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, বলিলেন, "আপনি ভাবিবেন না, আমাদের এখনও যাহা কিছু আছে, তাহা বিক্রয় করিয়াই

শ্রাদ্ধ করিব।” নীলকমলও সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রামচরণও আসিয়া উপস্থিত হইল। রামচরণ বলিল, “গোলাতে ধান আছে, কাল লোক ডাকাইয়া চাল ও চিড়া ইত্যাদি করিতে দিই ; বাগান হইতে দুই একটা গাছ কাটিয়া কাঠ কর্‌ব, আর সব বিষয় ভাবিবার সময় পরে হইবে।” রামচরণের কথা শুনিয়া নীলকমলের মা একটু সাহস পাইলেন। তিনি বলিলেন, “চরণ, তবে তুমি তাই কর, নীলকমল কিছু জানে না, উনি তোমাকে কত ভালবাসিতেন ; এখন তুমি তাঁহার পুত্রের কাজ কর।” সেইদিন হইতে প্রত্যহ নীলকমলের মা, নীলকমল ও রামচরণ এই তিনি জনে শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। রামচরণ ভূতের মত খাটিতে আরম্ভ করিল, সারা দিন মজুরের সঙ্গে কাঠ কাটা, স্থান পরিস্কার করা— এই সব করিতে লাগিল। রামজয় বাবুকে সকলে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, যাহাকে যাহা বলা হইল সে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা করিতে প্রস্তুত হইল।

গ্রামের গোয়ালাদের মধ্যে যে প্রাচীন, সে আপনি আসিয়া বলিল, "মাকে বল যত দই, দুধ, ঘি লাগিবে আমি সব যোগাইব, টাকা সুবিধামত যখন যা পারেন দিবেন।" নীলকমলের পিসা মহাশয়েরাও তাঁহাদের বাড়ী হইতে কতক কতক জিনিস আনিতে পারিবেন বলিবেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা আপনা হইতে কলাপাতা, তরীতরকারী ইত্যাদি পাঠাইয়া দিবে, বলিয়া গেল। চারিদিকে যখন আয়োজন চলিতে লাগিল, তখন রামগোপাল বাবুও চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। শেষে বিশেষ সমারোহে না হউক, সুন্দররূপেই শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। লোকে বলিতে লাগিল "হবে না, মন ছিল কেমন? চিরদিন পরের সেবা করেছে, তার কাজ হবে না, একি কখনও হয়? কিন্তু তাহারা ত জানেনা, শ্রাদ্ধের জন্য রামজয় বাবুর অবশিষ্ট যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল, তাহাও বিক্রয় করিতে হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সংগ্রাম।

এইবার বাড়ীর সকল গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে,—রামজয় বাবুর শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। আত্মীয়স্বজন যিনি যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সকলেই আপন আপন বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন; সকলেরই কাজ-কর্ম্ম আছে; শোকার্ত্ত পরিবারের সঙ্গে খুব সহানুভূতি থাকিলেও কেহ ত চিরদিন আর তাহাদের কাছে থাকিতে পারেন না। রামজয় বাবুর বাড়ী এখন নিস্তব্ধ,—অনেকটা পালান বাড়ীর মত হইয়াছে। বাড়ীর কুকুর বিড়ালগুলি পর্য্যন্ত নীরব; তাহারাও যেন বুঝিতে পরিয়াছে, আর সে দিন নাই। শোক এবং বিপদের প্রথম অবস্থাতে মনে একপ্রকার বল আসে। যাহারা কখনও দুঃখের মুখ দেখে নাই, দারিদ্র্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাতনা ও অপমান কি, তাহা বোঝে না, তাহারা প্রথমে অবস্থার পরিবর্ত্তনকে তত ভয় করেনা, তখন দারিদ্র্যের

করিয়া যাহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে প্রণাম করিল। সকলকে প্রণাম করিয়া আবার মায়ের পায়ের ধূলা লইতে আসিল। উভয়ের মন তখন শ্রাবণের বারিপূর্ণ মেঘের ন্যায়। নীলকমলের মা পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া মঙ্গল-ঘট হইতে বিল্বপত্র লইয়া তাহার উত্তরীয়-প্রান্তে বাঁধিয়া দিলেন। নীলকমলের তখন চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে; সে আর চোখের জল রাখিতে পারে না, তাই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। রামচরণও সকলকে প্রণাম করিয়া বাহির হইল। নীলকমলের মা বহির্ব্বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। যতক্ষণ তাহাদিগকে দেখা যাইতে লাগিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, তাহার পর শূন্য মনে গৃহে ফিরিয়া গৃহকার্য্যে মন দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শরীর ও মন উভয়ই অবসন্ন। পুত্রের অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়া তিনি কোনমতে অশ্রুজল সম্বরণ করিলেন। কিন্তু যেন হৃদয়ের প্রতি-আঘাতে তিনি নীলকমলের পাদক্ষেপ অনুভব করিতেছেন।

নীলকমল প্রথম খানিকক্ষণ খুব জোরে হাঁটিতে লাগিল। সে তখন কাঁদিতেছিল, রামচরণ যাহাতে তাহা দেখিতে না পায়, এই জন্য রামচরণের আগে আগে দ্রুত চলিতে লাগিল। রামচরণ বলিল, "অত জোরে হেঁটোনা, তাহা হইলে শীঘ্র হাঁপাইয়া পড়িবে ; আস্তে চল।" সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে তাহারা গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া চলিল। নীলকমল খানিক দূর যায়, আর গ্রামের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকায়। রামচরণ তাহাকে ভুলাইবার জন্য নানা গল্প আরম্ভ করিল। এইরূপে তাহারা দুই জনে চলিতে লাগিল। নীলকলের হাতে শুধু একটি ছাতি ; রামচরণের বগলে বোঁচকা। যত রোদ উঠিতে লাগিল, তত নীলকমলেরও হাটুনী কমিতে লাগিল। খানিক দূর যাইয়া বলিল, "চরণ দা, আমরা কতদূর এলাম ?"

রামচরণ। চারি মাইল।

নীলকল। বল কি ? সেই ভোর হইতে হাঁটি-তেছি, এখনও চারি মাইল !

রামচরণ। চারি মাইল পথ কি কম? এখন একটু বসিবে?

তখন দুইজনে একটা গাছতলায় বসিল। এতক্ষণে নীলকমলের ভয় হইতে লাগিল, সে বুঝি ষোল মাইল পথ হাঁটিতে পারিবে না। রামচরণের মনে প্রথম হইতেই ভয় ছিল। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তাহারা আবার হাঁটিতে লাগিল; কিন্তু তখন ঘন ঘন বিশ্রাম করিবার প্রয়োজন হইতে লাগিল। এইরূপে খানিক হাঁটিয়া, খানিক বিশ্রাম করিয়া, বেলা ৯টা আন্দাজ সময়ে তাহারা প্রায় অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া একটী বাজারে উপস্থিত হইল।

নীলকমল ও রামচরণ একটী দোকানে গিয়া আশ্রয় লইল। দোকানী একটী মাদুর পাতিয়া দিল; নীলকমল একেবারে তাহাতে শুইয়া পড়িল। রৌদ্রের উত্তাপে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। সুন্দর টুক্‌টুকে ছেলেটী দেখিয়া দোকানীর মন আর্দ্র হইল। সে তাহাকে মাথায় দিবার জন্য একটি

বালিশ দিতে চাহিল ; নীলকমল বলিল, "দরকার নাই। বোঁচকাটী মাথায় দিতেছি।" তখন দোকানী তাহাদের বাড়ী কোথায়, কোথায় যাইতেছে এই সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রামচরণ অনেক কথা বলিতে যাইতেছিল। নীলকমল তাহাকে টিপিয়া বারণ করিয়া নিজে দুই এক কথায় উত্তর দিয়া দোকানীকে তাহাদের কিছু খাবার আয়োজন করিতে বলিল।

দোকানী বলিল, "আমার ঘরে ভাল দই আছে, দোকানে চিড়া সন্দেশ আছে, এখনই আপনাদিগকে আনিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সে দোকানের পশ্চাতে বাড়ীর ভিতর গেল। নীলকমল এই অবসরে রামচরণকে বলিল ; "দেখ রামচরণ দাদা, এখনই একটা কথা তোমাকে বলিয়া রাখি। কাহারও কাছে বাবার নাম করিয়া পরিচয় দেওয়া হইবে না। আমাদের এখন দুরবস্থা হইয়াছে, কি জানি, কে কেমন ব্যবহার করিবে ? আমি ঠিক করিয়াছি, অপরিচিত লোকের নিকট গিয়া যদি

অনেক অপমান সহ্য করিতে হয় তাও করিব, কিন্তু পরিচিত লোক যে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিবে, তাহা সহ্য হইবে না। যদি বাবার বন্ধুদের কেহ আপনা হইতে সংবাদ লন সে ভাল, কিন্তু কাহারও দ্বারে অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া যাইব না।" রামচরণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইল।

ইতিমধ্যে দোকানী তাহাদের আহারের অয়োজন করিয়া আনিল। সাধারণতঃ খরিদ্দারদিগকে যেরূপ যত্ন ও আদর করে, ইহাদিগের প্রতি সে তদপেক্ষা অধিক মনোযোগ দিতেছিল। বোধ হয় নীলকমলকে দেখিয়া তাহার মনে মায়া হইতেছিল! নীলকমল ভাবিল যে, কিছু আহার করিলে তাহার গায়ে একটু জোর হইবে, তখন সে আবার হাঁটিতে পারিবে। কিন্তু অল্পক্ষণ বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার পা ফুলিয়া উঠিল ও পায়ে বেদনা করিতে লাগিল। কখনও হাঁটা অভ্যাস নাই; এতখানি পথ যে চলিয়া আসিয়াছিল, সে কেবল মনের জোরে। এখন যতই সময় যাইবে ততই পায়ের

বেদনা বাড়িবে, রামচরণের ত বড় ভয় হইল। এখনও অর্দ্ধেক পথ পড়িয়া রহিয়াছে। কি করিয়া তাহারা গোয়াড়ী পৌঁছিবে? ছেলে মানুষ, সাহস করিয়া দুজনে সংসার সমুদ্রে ঝাপ দিয়াছে। জানে না জীবনের পথ কত কণ্টকময়।

কি করে? যাইতে ত হইবেই। নীলকমল বলিল, "চরণদা ওঠ, আস্তে আস্তে যাওয়া যাক।" রামচরণ তখন আর একটী উপায়ের সন্ধানে ছিল। তাহারা দোকানে আসিবার পরে একখানি গরুর গাড়ী আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছিল; তাহাতে একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছিলেন। কথাবার্ত্তায় জানা গেল, তিনিও গোয়াড়ী যাইতেছেন। চরণ ভাবিতেছিল, কোন রকমে এই ভদ্রলোকের গাড়ীতে নীলকমলকে উঠাইয়া দেওয়া যায় কিনা। রামচরণ সেই উদ্দেশ্যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়াছিল। নীলকমলের কথা শুনিয়া সে বলিল, "উচিত ত, কিন্তু তুমি যে কি করিয়া হাঁটিবে তা ত বুঝিতে পারিতেছিনা; এখনই পা ফুলাইয়াছ,

তবুও ত অর্দ্ধেক পথ পড়িয়া আছে।" ভদ্রলোকটী নীলকমলের পায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ, তোমার পা ত ভয়ানক ফুলিয়াছে; হাঁটা দূরে থাকুক, তুমি একটু পরে দাঁড়াইতেও পারিবে না। তুমি বুঝি এই প্রথম বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। এক কাজ কর, আমিও গোয়াড়ী যাইতেছি; গাড়ীতে আমি একা আছি, তোমার স্থান হইবে। তুমি আমার গাড়ীতে ওঠ।"

নীলকমলের চক্ষু দুটী কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল। কি বলিয়া সে ভদ্রলোকটীকে ধন্যবাদ করিবে তাহা বুঝিতে পারিল না। আস্তে আস্তে বলিল, "আপনার কষ্ট হইবে না?" ভদ্রলোকটী বলিলেন, "কিছু কষ্ট হইবে না। তোমরা আর একটু অপেক্ষা কর; গরু দুইটাকে খাওয়াইতে দিয়াছি; একটু পরে আমরা বাহির হব। সকলে এক সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বেশ যাব।" সেই প্রস্তাবই ঠিক হইল। দোকানীও বড় খুসী হইল। সে বলিল, "আমি ইতিমধ্যে একটু নুন ও হলুদ গরম

করিয়া তোমার পায়ে লাগাইয়া দিই ; তাহা হইলে পায়ের বেদনা কমিবে।”

আমরা অনেক সময় সংসারের কুটিলতা ও নিষ্ঠুরতাই দেখি। কিন্তু প্রতিদিন কত দিকে কত ভাবে যে মানুষের অযাচিত করুণা ও ভালবাসা পাই, তাহা ভুলিয়া যাই। যদি মানুষের মনে এই প্রকার স্বাভাবিক ভালবাসা না থাকিত, তাহা হইলে সংসার কি চলিত ? সংসারে কুটিলতা ও নিষ্ঠুরতা আছে বটে, কিন্তু তাহার অধিক দয়া, প্রেম ও সাধুতা আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সেই দিন সন্ধ্যাকালে নীলকমল ও রামচরণ তাহাদের গোয়াড়ির বাসায় আসিয়া পৌঁছিল। ভদ্রলোকটীর অনুগ্রহে তাহাদের পথে আর কোনও কষ্ট হয় নাই। গোয়াড়ি সহরের মধ্যে প্রবেশ

করিয়া একটী চৌরাস্তার মোড়ে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইতে হইবে। নীলকমল সেইখানে গাড়ী হইতে নামিয়া ভদ্রলোকটীর নিকট অনেক কৃতজ্ঞতা জানাইল। রামচরণ বলিল, "ভগবান দয়া করিয়া আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছিলেন। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে গাড়ীতে তুলিয়া না লইতেন তাহা হইলে আজ আমাদের যে কি হইত, আমি তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না।" ভদ্রলোকটী তাহাকে আর বেশী বলিতে না দিয়া বলিলেন, "না, না, না, তোমাদের পাইয়া আমার ভালই হইয়াছিল তোমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে আমি গাড়ীর যন্ত্রণার কথা ভুলিয়াছিলাম, তা না হইলে এই টানা পথে চলা কি দুষ্কর হইত। যমরাজার পুরাতে নাকি লোহার মুগুর দিয়া পাপীদের হাড় গুঁড়া করে। যমরাজা কয়েক-খানি গরুর গাড়ী নিয়ে পাপীদিগকে তাহাতে আচ্ছা ক'রে বোঝাই ক'রে ঘুরিয়ে নিলেই সে কাজ হয়। তোমরা এখান হইতে যাইতে পারিবে তো! তাহা

হইলেই হইল।” তখন নীলকমল ও রামচরণ ভদ্রলোকটীকে নমস্কার করিয়া তাহাদের বাসার অভিমুখে চলিল।

তাহারা যখন বাসায় পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাসায় একটী প্রদীপও জ্বলে নাই। যেখানে দিনরাত্রি লোকের ভিড় লাগিয়াই থাকিত, তাহা এখন নিস্তব্ধ; জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই। রামচরণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া “শ্যামার মা” বলিয়া কয়েকটী ডাক দিতেই বাহির হইতে এক বুড়ী আসিল। বুড়ী তাহাদিগকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্যামার মা অনেক কাল এই বাসায় কাজ করিতেছে; কাজেই তাহার একখানি ঘর আছে; সারাদিন কাজ করিয়া রাত্রিতে সেখানে গিয়া শুইয়া থাকে। সে রামজয় বাবুর গোয়াড়ীর বাসায় গৃহিণী ও ঝি দুয়েরই কাজ করিত। অনেক দিন কাজ করিয়াছে; এদের উপর তার একটা মায়া বসিয়া গিয়াছিল। রামজয় বাবু পীড়িত হইয়া বাড়ী রওনা হইয়া গেলে, আর সকল চাকর

বাকরেরা কয়েক দিন দেখিয়া কোথায় সরিয়া পড়িল। শ্যামার মা বাসা আগ্‌লাইয়া পড়িয়া রহিল, প্রতিদিন ঘর দুয়ার ঝাট দেয়, যতটা পারে বাড়ী পরিষ্কার রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাড়ীতে লোক না থাকিলে দু দিনেই বাড়ী হতশ্রী হইয়া উঠে। উঠানে বড় ঘাস হইয়াছে, চারিদিকে আগাছা জন্মিয়াছে। বাসার অবস্থা দেখিয়া রামচরণেরও চোকে জল আসিতে লাগিল। কিন্তু সে আপনাকে সামলাইয়া বলিল, "শ্যামার মা, একটী আলো জ্বালিবার বন্দোবস্ত কর, ঘর খোল ও বাহিরে তক্তপোষের উপরে একটা কিছু পাতিয়া দাও, নীলকমল দাঁড়াইতে পারিতেছে না, উহার পায়ে ব্যথা হইয়াছে।"

শ্যামার মা প্রথমে তাহাদের পা ধুইবার জল দিয়া একটী প্রদীপ জ্বালিবার বন্দোবস্ত করিল। তাহার পরে বাহিরে তক্তপোষের উপরে একটা সতরঞ্চ ও বালিস দিয়া তাহাদের কাছে বসিল। রামচরণ তখন এতদিনে বাসায় কি হইয়াছে সব

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। শ্যামার মা বলিল, "জমিদার বাবুদের বাড়ী হইতে লোক আসিয়া কাগজপত্র যাহা ছিল লইয়া গিয়াছে! চাকরেরা সব চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীওয়ালার লোকেরা দুই তিন দিন আসিয়াছিল। আমি তাহাদিগকে আরও কিছু দিন পরে আসিতে বলিয়াছি। তোমরা আসিয়াছ শুনিলে হয় ত কালই আবার লোক আসিবে।" রামচরণ বলিল, "আচ্ছা এখন আজকার মত দুটা ত খাওয়ার যোগাড় করিতে হয়; সমস্ত দিন নীলকমল ভাত খায় নাই।" শ্যামার মা বলিল; "আমি এখনই উনান ধরাইয়া দিচ্ছি: চারটী ভাতে-ভাত রাঁধিয়া লইলেই হইবে।" নীলকমল বলিল, "না, শ্যামার মা, আজ রাত্রিতে হোটেল হইতে খাইয়া আসি। বেশ গরম ভাত ও মাছের ঝোল পাওয়া যাইবে।" রামচরণও বলিল, "সেই ভাল। তুমি তো এটুকু হাঁটিতে পারিবে? শ্যামার মা, তুমি বরং একটু গরম তেল দিয়া নীলকমলের পা একটু মালিস করিয়া দাও। ভাগ্যে আমাদের

সমস্ত পথ হাঁটিতে হয় নাই। বাঙ্গালঝির বাজারে একজন ভদ্রলোক নীলকমলকে আপনার গাড়ীতে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়াছিল। কিন্তু ঐটুকু আসিতেই আসিতেই তার পা ফুলিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালঝির বাজারে এক দোকানী খানিক নুন-হলুদে গরম করিয়া নীলকমলের পায়ে লাগাইয়া দিয়াছিল।"

"বাছার আমার কখন খড়টা ভেঙ্গে দুখানি করতে হয় নাই, এত কষ্ট সবে কি করিয়া ?"—এই বলিয়া শ্যামার মা তাড়াতাড়ি তেল গরম করিতে গেল; অল্পক্ষণের মধ্যে তেল দিয়া বেশ করিয়া সে নীলকমলের পা মালিস করিয়া দিল। তাহার পর নীলকমল হোটেলে খাইতে গেল। হোটেলে একদিকে কয়েকজন লোক খাইতেছে, আর একদিকে কতকগুলি লোক উঠিয়া যাইতেছে, চারিদিকে অপরিষ্কার দেখিয়াই তো নীলকমলের বিরক্ত লাগিতে লাগিল। কিন্তু কি করে, সারাদিন ভাত খায় নাই, তার বড় ক্ষুধা লাগিয়াছিল। তারি মধ্যে এক পাশে একটু স্থান করিয়া তাহারা খাইতে

বসিল। অন্য সময় হইলে নীলকমল সে খাবার খাইতে পারিত কি না, জানি না। কিন্তু আজ সারা দিনের শ্রান্তির পর ইহাই তাহার নিকট মধুর লাগিতে লাগিল। নীলকমল ও রামচরণ ফিরিয়া আসিলে, শ্যামার মা আরও খানিক ক্ষণ তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া আপনার বাড়ী গেল। সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর তাহাদের খুব ঘুম আসিতে লাগিল। দুই জনে দুইটী শয্যা পাড়িয়া শয়ন করিল। রামচরণ তখন বলিয়া উঠিল, "ভগবান ত একটা দিন কাটাইয়া দিয়াছেন; আমি ভাবিয়াছিলাম, আজ বুঝি আর গোয়াড়ীতে পৌঁছিতে পারিব না। এখন আমাদের যে দিন যায়, সেই দিনই ভাল। আজ ঘুমাও। কাল সকালে উঠিয়া আমি চাকরীর সন্ধানে বাহির হইব, তুমি স্কুলে যাইবে।" নীলকমল বলিল, "মা এতক্ষণ আমাদের জন্য ভাবিতেছেন; এখন যদি পাখী হইয়া গিয়া বলিয়া আসিতে পারিতাম, মা, আমরা ভাল আছি! মা হয়ত আজ রাত্রিতে ঘুমাইবেন না।" রামচরণ

বলিল, "কাল সকালেই তুমি একখানি চিঠি লিখিয়া দিও ; আজ আর ভাবিও না, ঘুমাও।" অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। ঘুমের মত এমন ঔষধ আর নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহারা সকল শ্রান্তি, সকল ভয়, সকল চিন্তা ভুলিয়া গেল।

পর দিন প্রাতে উঠিয়া রামচরণ চাকরীর সন্ধানে ও অন্যান্য খোঁজে বাহির হইল ও নীলকমলকে স্নান করিয়া খাইয়া স্কুলে যাইতে বলিল। সকালে আসিয়া শ্যামার মা আবার গরম জল করিয়া নীলকমলের পা মালিস করিয়া দিল। নীলকমল মাকে একখানি চিঠি লিখিল। চিঠিখানি লিখিতে কতবার তাহার চোকে জল আসিতে লাগিল।

শ্রীচরণকমলেষু,—

মা, আমার মা, এমন অবস্থায় তোমাকে ছাড়িয়া আসিতে, আমার বুক ফাটিয়া গিয়াছে। তুমি আমার জন্য ভাবিও না, কাঁদিও না। তোমার

আশীর্ব্বাদ আমাকে সকল বিপদে রক্ষা করিবে। মা, তুমি যে আমাকে বলিতে, ভগবান দুঃখীদের সহায়, সে কথার অর্থ আমি এখন বুঝিতেছি। কাল পথে খানিক দূর আসিতে আসিতেই আমি শ্রান্ত হইয়া প ড়িয়াছিলাম।

বাঙ্গালঝির বাজারে আসিয়া মনে হইল, আমি আর এক পাও নড়িতে পারিব না। কি আশ্চর্য্য, সেখানে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইল, তিনি গাড়ীতে গোয়াড়ী আসিতেছিলেন; আমাকে দেখিয়া তাঁহার গাড়ীতে উঠাইয়া লইলেন, আমাকে আর হাঁটিতে হইল না। তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরমেশ্বর জানিতেছিলেন, যে আমি আর হাটিতে পারিতেছিলাম না। কাল যদি সেই ভদ্রলোক দয়া করিয়া তাঁহার গাড়ীতে না লইতেন, তবে যে কি হইত, জানি না। পথে আমাদের আর কোনও কষ্ট হয় নাই। আমরা নিরাপদে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি, শ্যামার মা আমার কত যত্ন করিতেছে। আমি আজই স্কুলে যাইব। তুমি কিছু ভাবিও না।

বাড়ীতে যাহা যাহা হয়, সকল সংবাদ আমাকে দিও। সকলকে আমার ভালবাসা জানাইও। তুমি আমার ভক্তি ও ভালবাসা পূর্ণ প্রণাম লও। ইতি।

তোমার স্নেহের

কমল।

বেলা দশটার সময় স্নান করিয়া খাইয়া নীলকমল স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইল। পূর্ব্বে যখন স্কুলে যাইত তাহার সঙ্গে একজন দরোয়ান বই লইয়া যাইত। আগেকার কথা স্মরণ করিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছিল। কিন্তু দৃঢ়তার সহিত সে তাহা সম্বরণ করিল। বহুদিন পরে স্কুলে যাইতে তাহার মন আজ বড় বিষণ্ণ হইতেছিল। স্কুলের ছেলেরা কে কি বলিবে, কি রকম ব্যবহার করিবে, তাহার সেই ভয় হইতে লাগিল।

বিপদ ও দুরবস্থার সময় সমান অবস্থার লোকের সঙ্গে মিশিতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সঙ্কোচ ও ভয় হয়। যাহারা আমাদের উপরের লোক, তাঁহারা

দুটা অপ্রিয় কথা বলিলে ততটা লাগেনা, কিন্তু যাহাদের সঙ্গে সমভাবে অবাধে মিশিয়াছি, তাহারা যদি একটু অবজ্ঞার চক্ষুতে তাকায়, তাহা যেন হৃদয়ে বিঁধিয়া লায়। তাহার স্কুলের সমপাঠিদিগের সহিত দেখা করিতে নীলকমলের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কোচ হইতেছিল। নীলকমল পথে যাইতে যাইতে, সকলের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহাদের কথার কি উত্তর দিবে, এই সকল ভাবিতেছিল। সে যখন স্কুলে পৌঁছিল, তখনও কাজ আরম্ভ হয় নাই। তাহাকে দেখিয়াই অনেক গুলি ছেলে আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল। "ভাই, তুমি এত দিন আস নাই কেন?" "কোথায় ছিলে?" ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। নীলকমলকে কোন উত্তর দিতে হইল না। দুই একজন ছেলে নীল কমলের বাবার মৃত্যুর কথা শুনিয়াছিল, তাহারা বলিতেই সকলে চুপ করিল। নীলকমল ক্লাশের মধ্যে খুব ভাল ছেলে ছিল, সেই জন্য অনেকেই তাহার খুব অনুগত; তাহাকে দেখিয়া তাহারা খুব খুসী হইয়াছিল।

একজন বলিল, "ভাই, এই মাস হইতে রেজেষ্টারীতে তোমার নাম উঠায় নাই; তুমি আফিসে গিয়া বলিয়া এস।" তাহার সহপাঠিগণের মধ্যে একটি ছেলের সঙ্গে তাহার খুব বন্ধুতা ছিল, তাহার নাম যতীন্দ্র; অত গোলমালের মধ্যে মনের কথা বলিবার সুবিধা হইবে না বলিয়া, সে এতক্ষণ পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল; একটু ভিড় কমিলেই সে নীলকমলকে ডাকিয়া বলিল, "এস, আমি তোমার সঙ্গে আফিসে যাইতেছি।" নীলকমল আসিয়া আস্তে আস্তে তাহার পাশে দাঁড়াইল, দুই বন্ধুতে নীরবে পরস্পরের হাত ধরিল; আর কিছু বলিতে হইল না; উভয়ে উভয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিল। আফিসের কেরাণী বাবু নীলকমলকে জানিতেন, তিনি বলিলেন, "নীলকমল, তুমি আসিয়াছ? তোমার পিতার মৃত্যু-সংবাদ আমি পাইয়াছি; তাঁহার মত লোক হয় না। তোমার ভাই কোথায়? তোমাদের পড়া-শুনার কি হইতেছে? তোমার এক কাকা আছেন নয়? তিনি কি সব বন্দোবস্ত

করিতেছেন ?” নীলকমল আস্তে আস্তে বলিল, “না, মহাশয়, আমার কাকা কিছু করিতে পারিলেন না, আমার ভাই বাড়ী আছে ; আপাততঃ আমি একাই আসিয়াছি। যদি কিছু সুবিধা করিতে পারি তাহা হইলে ভাইকে পরে আনিব। আমার কি নাম কাটা গিয়াছে ?” “হাঁ, দুই মাসের বেতন বাকী হইয়াছিল বলিয়া এবার নাম উঠান হয় নাই ; তুমি কি টাকা দিতে পারিবে ? তাহা হইলে এখনি নাম লিখিয়া লই, যদি টাকা দিতে না পার, তাহা হইলে সাহেবকে গিয়া বল। দেখি দাঁড়াও, আমিই তোমাকে সাহেবের কাছে লইয়া যাইতেছি।” এই বলিয়া দেরাজের চাবি বন্ধ করিয়া কেরাণী বাবু নীলকমলকে লইয়া সাহেবের কাছে গেলেন। সাহেব মিঃ ষ্টিফেন কৃষ্ণনগর-কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল, অতি জ্ঞানী এবং উদারচেতা লোক। নীলকমলকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন ‘Oh my boy, where had you been so long ?” নীলকমল ক্লাশের মধ্যে সব চেয়ে ভাল ছেলে। মিঃ ষ্টিফেন তাহাকে

বেশ জানিতেন ; ক্লাশে তাহাকে এতদিন না দেখিয়া তিনি বড় ক্ষুণ্ণ ছিলেন। কেরাণী বাবু তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিলেন। মিঃ ষ্টিফেন বলিলেন "আচ্ছা আমি সব দেখিতেছি, আর কিছু বলিতে হইবে না, আপনি অন্য কাজ দেখুন।" সাহেব নীলকমলকে একখানি চেয়ার অনিয়া দিয়া কাছে বসিতে বলিলেন, নীলকমল বসিতে চাহিল না, দাঁড়াইয়াই কথা বলিতে লাগিল। সাহেব বলিলেন, "আমি তোমার পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তুমিই বুঝি জ্যেষ্ঠ পুত্র, তোমার পিতা কি কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই ? আচ্ছা এখন কি করা যায় বল ত ?" নীলকমল বলিল, "আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে বিনা বেতনে পড়িতে দেন, তাহা হইলে আপনার নিকট চিরদিন বাধিত হইব। নতুবা, আমার পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে।"

সাহেব বলিলেন, "তাহা কখনই হইতে পারে না তোমার পড়া কোনমতেই বন্ধ হওয়া উচিত

নয়। কলেজে ত বিনা বেতনে পড়িবার নিয়ম নাই ; কিন্তু বেতনের জন্য ভাবিও না, আমি তাহা ঠিক করিয়া দিব ; কিন্তু অবশিস্ট খরচ তুমি চালাইয়া লইতে পারিবে ত ?" নীলকমল তখন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া গেল, সে ভাবিল যে, তাহার সকল সংগ্রামের অবসান হইল। বলিল, আমি আর সব ঠিক করিয়া লইতে পারিব।" সাহেব তখন এক টুকরা কাগজে লিখিয়া দিলেন, "Get his name entered in the Register and put down the amount of his fees on my account." বলিলেন, "এইটা কেরাণী বাবুকে দিয়া তুমি ক্লাশে গিয়া পড়িতে আরম্ভ কর।" নীলকমল দুয়ার পর্যান্ত গিয়াছে, তখন সাহেব আবার তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যখনই তোমার কিছু অভাব হইবে, আমাকে আসিয়া বলিবে। আমাকে তোমার একজন বন্ধু মনে করিবে, তাহা হইলে আমি বড় আনন্দিত হইব।" নীলকমলের চোখে জল আসিয়াছিল, সাহেবের কাছে কি সে কথা বলিতে

পারে ? তবুও ধন্যবাদ করিতে যাইতে ছিল। কিন্তু সাহেব তখন চেয়ার হইতে উঠিয়া ক্লাশে যাইবার জন্য বাহির হইলেন। নীলকমলের ঘাড়ে হাত দিয়া বলিলেন, "তুমি ক্লাশে যাও, আমি নিজেই আফিসে গিয়া বলিয়া দিতেছি।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মিঃ ষ্টিফেন।

সেদিন স্কুলের ছুটীর পর নীলকমল অতিশয় হৃষ্ট মনে বাসায় ফিরিল। আসিয়া দেখে যে, রামচরণ তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। রামচরণ প্রাতঃকাল হইতে অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়াছিল। যে সকল কাজে গিয়াছিল, তাহার কিছুই সুবিধা করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ বাড়ী ওয়ালার কাছে গিয়াছিল, দুই তিন মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী পড়িয়াছে। রামজয় বাবুর বাড়ীর

বিপদের কথা শুনিয়া যদি বাড়ীওয়ালা কিছু টাকা ছাড়িয়া দেয়, তাহার সেই চেষ্টা ; কিন্তু সে কিছু বাদ দিতে স্বীকৃত হইল না, বরং শীঘ্র বাকী টাকা পরিস্কার করিয়া দিয়া বাড়ী ছাড়িয়া দিতে বলিল। বাড়ীওয়ালার ব্যবহারে সে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। রামজয় বাবু অনেক বৎসর হইতে সে বাড়ীতে ছিলেন ; বরাবর নিয়মমত ভাড়া দিয়া আসিতেছেন, তবুও তাঁহার পরিবারের এই বিপদের সময় বাড়ীওয়ালা এক মাসের ভাড়াও ছাড়িয়া দিবেনা। সংসারী লোকের টাকার মায়া দেখিয়া তাহার মনটা বড়ই চটিয়া গেল। চটিয়া গেলে কি হইবে ? যতক্ষণ তাহার পাওনা টাকা শোধ না দিতে পারে, ততক্ষণ চুপ চাপ করিয়া থাকাই ভাল মনে করিয়া সে সাত দিনের সময় চাহিল। সাত দিনের মধ্যেই বাকী টাকা শোধ করিয়া দিবে বলিয়া সে সেখান হইতে বাহির হইল। তার পর চাকরীর চেষ্টায় কয়েক স্থানে গেল। কোথাও কিছু সুবিধা হইল না। সুতরাং রামচরণের মনটা আজ বড়ই

দমিয়া গিয়াছে সে বিকালে আবার বাহির হইবে মনে করিয়াছে। কিন্তু নীলকমল স্কুল হইতে ফিরিয়া না আসিলে সে বাহির হইতে পারে না। নীলকমলকে হাসি-মুখে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাহার মনে একটু সাহস হইল। বিপদের সময় পরিচিত লোকের মুখ দেখিলেও মনে বল আসে। নীলকমল তাহাকে বলিল যে, সাহেব বিনা বেতনে তাহাকে স্কুলে পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। রামচরণ এই সংবাদে যেন অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিতে পাইল। বলিল, "যাক্ এখন আর তোমার পড়া বন্ধ হইবার ভাবনা নাই। আমি কোথাও কি পাঁচ টাকা মাইনের চাকরীও পাইব না? তাহা হইলেই তোমার খরচ চলিয়া যাইবে। বাড়ীওয়ালার ব্যবহারটা দেখিয়াছ! এতকাল ভাড়া খাইয়াছে, আজ বিপদের দিনে এক মাসের ভাড়াও ছাড়িয়া দিল না। না হয় মনে করিত, বাড়ীটা এক মাস পড়িয়া ছিল। এমন ত দণ্ডও যায়।"

নীলকমল। না ছাড়িলে আর কি করিবে! ভাড়াত ন্যায্য পাওনা টাকা বটে।

রামচরণ। ন্যায্য পাওনা সত্য; কিন্তু আইনই সব নয়। মানুষের আবার একটা দয়া-ধর্ম্মও আছে। তা এখন ওর টাকাটা শোধ করিয়া দিবার উপায় কি? সাত দিনের মধ্যে টাকা দিতে হইবে।

নীলকমল। বাসায় যে সকল জিনিস-পত্র আছে, সেইগুলি বিক্রয় করিয়াই টাকা দিতে হইবে। জিনিসগুলি বেচিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু না বেচিলে রাখা যাইবে কোথায়? সুতরাং ও গুলি বেচিতেই হইবে। বোধ হয়, উহাতে যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহাতে বাড়ী-ভাড়ার টাকা যথেস্ট হইবে।

রামচরণ। ন্যায্য দাম হইলে বাড়ী-ভাড়ার টাকার চেয়ে অনেক বেশীই হয়। কিন্তু এখন আমাদের গরজে বিক্রয় করিতে হইবে। পাঁচ টাকার জিনিসটার দাম দুই টাকা হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়াও আর উপায় নাই। আমি এখনই

বাহির হইব। জিনিসগুলি বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করি। আর চাকরীও একটা খুঁজিয়া দেখি, দেরী করিবার সময় নাই। তোমার থাকিবার একটা স্থানও খুঁজিতে হইবে।

নীলকমল। আমার থাকিবার বন্দোবস্ত ভিন্ন স্থানে না করিয়া তুমি যেখানে কাজ করিবে, সেখানে হইলে ভাল হয়। দেখ যদি একটা ছেলেদের মেসে চাকরী পাও, তাহা হইলে বেশ হয়। আমিও সেখানে থাকি, তোমার কাজের কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারি।

রামচরণ। এ পরামর্শ খুব ভাল বলিয়াছ। তুমি আমার নিকটে থাকিলে অমি খুব নিশ্চিন্ত থাকিতে পরি। তোমাকে আমার কাজের কিছু সাহায্য করিতে হইবে না। তবে আমি কাছে থাকিলে তোমার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, করিয়া দিতে পরিব। তুমি এখন তাহা হইলে জল খাও। শ্যামার মা তোমার জন্য জলখাবার ঠিক করিয়া রাখিয়াছে।

নীলকমল। আচ্ছা তুমি যাও। আমি জলখাবার খাইয়া একবার বিনোদের বাড়ী যাইব। আমি দুই মাস পড়ি নাই। ক্লাসে অনেক পড়া হইয়া গিয়াছে। বিনোদের কাছে একটু পড়া শুনা দেখিয়া লইব। যদি আমার আসিতে দেরী হয়, ভাবিও না।

নীলকমল এখন হইতে প্রতিদিন স্কুলে যাইতে লাগিল। যে পর্য্যন্ত অন্য উপায় না হয়, দুই বেলা হোটেল হইতে খাইয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিল। অনেক দিন পড়া শুনা বন্ধ ছিল, সেই জন্য তাহাকে আজ কাল খুব খাটিতে হইবে। রামচরণ বাড়ী-ওয়ালার টাকা যোগাড় করা ইত্যাদির ভার নিজে লইয়া তাহাকে এক মনে পড়িতে বলিল। নীলকমল অনেক সময়ই তাহার সমপাঠী বিনোদের কাছে গিয়া পড়ে। রামচরণ চাকরীর সন্ধানে সকাল-বিকালে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু সুবিধা মত চাকরী কোথাও মিলে না, ওদিকে তাহাদের হাতে যে সামান্য অর্থ ছিল, তাহাও ফুরাইয়া আসিতে

লাগিল। বাসার জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া যে টাকা হইল, তাহাতে কোন রকমে বাড়ী ভাড়ার টাকা শোধ হইবে। দেখিতে দেখিতে সাত দিন হইয়া গেল। কাল তাহাদিগকে বাড়ী ছাড়িয়া দিতে হইবে; এখন তাহারা দাঁড়াইবে কোথায়? নীলকমল কৃষ্ণনগরে আসিয়া তাহার পিতার বন্ধুদের কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নাই। এখন কাহারও আশ্রয় ভিক্ষা করিতে সে প্রস্তুত নহে। হোটেলে না হয় আরও কয়েক দিন খাওয়া চলিতে পারে, কিন্তু তাহারা থাকে কোথায়? রামচরণ সে দিন সকালে আবার বাহির হইল। আজ যদি ভগবান একটী চাকরী মিলাইয়া না দেন, কাল যে তাহারা কোথায় দাঁড়াইবে সেই ভাবনায় তাহার মন বড় বিষণ্ণ। বেলা দশটা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া হতাশ হইয়া সে ফিরিতেছে, এমন সময়ে তাহার পূর্ব্বের পরিচিত একটি লোকের সঙ্গে দেখা হইল। সে একটী মেসে চাকরী করে। বাড়ী হইতে হঠাৎ তাহার পিতার কঠিন পীড়ার সংবাদ আসিয়াছে।

তাহাকে বাড়ী যাইতে হইবে। কিন্তু একজন লোক না দিলে বাবুরা ছাড়িতে চাহিতেছেন না। এই সংবাদ শুনিয়া রামচরণ বলিল, "আমি তোমার কাজ করিতে পারি, কিন্তু একটু কথা আছে। আমার মনিবের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার ছেলে এখানে পড়িতে আসিয়াছেন। তোমাদের বাবুরা যদি তাঁহাকে বাসায় থাকিবার স্থান দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি প্রাণ দিয়া তোমার কাজ করিতে পারি।" লোকটা বলিল, "তাহা ত আমি কিছু বলিতে পারি না। তবে আমাদের বাবুদের মধ্যে কেহ কেহ বড় ভাল লোক। তুমি আমার সঙ্গে এস, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।"

রামচরণ তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে চলিল। বাবুদের অনেকেই স্কুল-কলেজে চলিয়া গিয়াছে। কেবল তাঁহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক দুই তিন জন ছিলেন, তবে তাঁহারাই মেসের কর্ত্তা; সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা ঠিক হইল। তাঁহারা রামচরণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

সিঁড়ির পাশে একটা ছোট কুঠরী ছিল, সেই ঘরটী দিবে, নীলকমলকে মেসে দুই বেলা খাইতে দিবে, তদ্ব্যতীত রামচরণকে মাসে আরও দুই টাকা বেতন দিবে এই স্থির হইল। রামচরণ সেই দিন বিকাল হইতেই কাজে লাগিবে বলিয়া গেল। এই চাকরীটী পাইয়া তাহার খুব আনন্দ হইল। নীলকমলকে কাছে রাখিতে পাইবে ইহাতে তাহার মহা আনন্দ। বাড়ী আসিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া সে বাড়ীওয়ালার কাছে গেল। বাড়ীর টাকা মিটাইয়া দিয়া তাহাকে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিল। তাহার পর যাহা কিছু সামান্য জিনিসপত্র ছিল সেগুলি গুছাইয়া নীলকমলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নীলকমল আসিলে তাহাকে লইয়া নূতন কর্ম্মস্থানে আসিল। নীলকমলের প্রথম খুব আনন্দ হইল; কিন্তু যে কুঠরীতে তাহাকে থাকিতে হইবে, তাহা দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। যাহা হউক কোন রকমে দিন কাটাইতে হইবে। এ বৎসর সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে;

ভাবিল প্রাণপণে পড়িয়া কোনরূপে তাহাকে বৃত্তি লইতেই হইবে। বৃত্তি পাইলে আর তাহাদের কষ্ট থাকিবেনা। রামচরণ নীলকমলের বিছানা বই ইত্যাদি ঠিক করিয়া দিয়া বাসার কাজে মন দিল। নীলকমল সেই দিনই তাহার মাকে চিঠী লিখিল—চরণদার চাকরী হইয়াছে ও সেই বাসাতেই তাহার থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। তিনি এখন যেন তাহাদের জন্য আর না ভাবেন; আর বাড়ীতে কি করিয়া চলিতেছে, শীঘ্র যেন তাহা লেখেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নারীর বীরত্ব।

এদিকে বাড়ীতে নীলকমলের মা নীলকমল ও রামচরণকে বিদায় দিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ অসহায় অনুভব করিতে লাগিলেন; বাড়ীতে যে সমুদায় চাকর-চাকরাণী ছিল, তাহাদিগকে পূর্ব্বেই ছাড়াইয়া

দিয়াছেন। প্রাচীন চাকর চাকরাণীরা যাইতে চাহে না। তিনি তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন যে, "এখন তোমাদিগকে শুধু খাইতে দিতে পারি এমন সাধ্যও আমার নাই। ভগবান যদি কখনও দিন দেন, তবে আবার তোমাদিগকে ডাকিয়া আনিব। এখন তোমরা অন্যত্র কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া লও। যত দিন কাজ না পাও এখানে খাইও।" তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় হইল। সকলেই বলিতে বলিতে গেল, "এমন মনিব আর কোথায়ও পাইব না।" চাকর-চাকরাণী ছাড়াইয়া দেওয়ায় বাড়ীর সমস্ত কাজ তাঁহার ঘাড়ে পড়িল। তাঁহাকে সাহায্য করিবার আর কেহ নাই। বৃদ্ধ বয়সে দারুণ পুত্র-শোকে রামজয় বাবুর মা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন, গৃহ-কার্য্যে সহায়তা করা দূরে থাকুক, এখন তাঁহার শুশ্রূষার জন্যই একজন লোকের আবশ্যক। নীলকমলের মা সেজন্য চিন্তিত হইলেন না, কিন্তু বাহির-বাড়ীর কাজ কি করিয়া হইবে, তাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে

ঠিক করিলেন, রাত্রি থাকিতে উঠিয়া বাহিরের ঘর-দুয়ার পরিস্কার করিয়া আসিবেন। নীলরতন বার-বার বলিল, "মা বাহিরের কাজ করিবার জন্য অন্ততঃ একটা লোক রাখ।" তিনি বলিলেন, "না বাবা, মাইনে দিতে পারা যাইবেনা।" তিনি প্রতিদিন প্রত্যুষে পাখী ডাকিবার পূর্ব্বেই বাহিরের কাজ সারিয়া আসিয়া ভিতরের কাজ করিতেন। বাড়ীর অপরের ঘুম ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে তাঁহার সকল কাজ হইয়া যাইত। তখন বৃদ্ধা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সেবাতে নিযুক্ত হইতেন। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের ক্ষুধা খুব বাড়ে, সকাল সকাল স্নান করিয়া তাঁহাকে যতক্ষণ চারিটা ভাত দিতে না পারিতেন, ততক্ষণ বধূর মনে শান্তি হইত না। স্নান করিয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িবারও অবসর পাইতেন না।

তাহার পর যদি ঘরের অবস্থা ভাল থাকে, তাহা হইলে গায়ে শ্রম এত লাগে না। বাড়ীতে ত আয়ের কোন সংস্থানই নাই। কাপড় ছাড়িবেন কি কাপড়ই ত নাই। পূর্ব্বের যে সমুদয় কাপড়

ছিল, সে সমুদায়ই পেড়ে কাপড়, তাহা ত আর পরিতে পারিবেন না। শ্রাদ্ধের সময় কয়েকখানি কাপড় পাইয়াছিলেন তাহাতে কিছুদিন চলিল, তার পরে পেড়ে কাপড়গুলির পাড় ছিঁড়িয়া পরিতে লাগিলেন। ঘরে কিছু ধান ছিল তাহাতে আপাততঃ খাবার চলিতে লাগিল, কিন্তু তৈল, লবণ, তরকারি ইত্যাদি কিনিতে ত পয়সা লাগে। নিজের জন্য কিছু ভাবেন না। দিবসান্তে একবার চারিটী আতপ চাউলের ভাত, সৈন্ধব ও একটি কলা সিদ্ধ,—এই তাঁহার আহার। কিন্তু নীলরতন ও তাঁহার শাশুড়ীর জন্য তিনি বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। যদি বা বাড়ীতে শাক বেগুন কিছু হয়, কিন্তু তৈল, লবণ ও মসলা অভাবে তাহা রাঁধিবার উপায় হয় না। নীলরতন চিরদিন ভাল খাইয়া আসিয়াছে, তবু যাহা পায় অতি কষ্টে নীরবে তাই খায়। কিন্তু নীলকমলের মা শাশুড়ীকে লইয়া বড় মুস্কিলে পড়িলেন। তাঁহার দুইটি বিবাহিতা কন্যা ছিল। সময়ে সময়ে তাঁহারা মায়ের জন্য একটু গুড় কি

তেল কি ভালমন্দ দুই একটি জিনিস পাঠাইতেন, নীলকমলের মা পূর্ব্বে যে সব জিনিস নিজে কত লোককে অকাতরে দান করিয়াছেন, এখন অন্যের নিকট হইতে তাহা পাইয়াই অতিশয় কৃতজ্ঞ হইতেন। এত কষ্টেও তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন না। নিজে ত কখনও বাড়ীর বাহির হইতেন না; অপরে তাঁহার বাড়ীতে আসিলে যাহাতে আপনার সংসারের কষ্টের বিষয় জানিতে না পারে এমনি করিয়া কথা কহিতেন। কিন্তু তাঁহার শাশুড়ী অনেক সময়ে বলিয়া ফেলিতেন। বৃদ্ধ হইলে মানুষের অত হিসাব থাকে না; লোভও বেশী হয়। পাড়ার কেহ বেড়াইতে আসিলে তিনি বলিয়া ফেলিতেন যে, আমার অমুক জিনিস খাইতে ইচ্ছা করে। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের উপর তাঁহার ভয়ানক রাগ হইয়াছিল। তিনি যে বিপদের সময় কিছু সাহায্য করিলেন না বৃদ্ধা একথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেন না। রামজয় বাবু কোনও জিনিস পাঠাইলে তিনি তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। নীলকমলের মা

দেখিলেন, হাত-খরচের জন্য কিছু পয়সা দরকার হইবেই। অতি কষ্টে চলিলেও কাপড়, তৈল, তরীতরকারী এ সকলের জন্য মাসে তিন চারি টাকা ত লাগিবেই। তিনি তখন ভাবিতেন, আমি যদি এমন কোনও কাজ জানিতাম, যাহাতে ঘরে বসিয়া কিছু উপার্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে বেশ হইত। কাজের মধ্যে তিনি কাঁথা সেলাই করিতে জানেন। কিন্তু তারই বা সময় কই ? দিনে ত প্রায় অধিকাংশ সময়ই গৃহের কাজে যায়, দুপুরে যে একটু সময় পান, তাহাতে দুই তিন মাসে একখানি কাঁথা উঠে। রাত্রিতে খানিকক্ষণ সময় হইতে পারে, কিন্তু প্রদীপ জ্বালাইবার তৈল কোথায় পাইবেন ? দুই তিন মাস পরিশ্রম করিয়া একখানি কাঁথা সেলাই হইলে তাহার দাম দশ আনা কি বার আনা পয়সা পান। এখন দশ আনা পয়সা তাঁহার কাছে দশটা মোহরের সমান। হাতে পয়সা না থাকিলে বাড়ীর আপাততঃ অপ্রয়োজনীয় তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া চালাইতে হইত। এইরূপে কষ্টের সংসারে

নীলকমলের মা অসীম সহিষ্ণুতায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যে আপনার সুখ দুঃখ তিনি একেবারে সব ভুলিয়া গিয়াছেন, কেবল পরিবারের অপর সকলের জন্যই জীবন ধারণ করেন। দারুণ শোক ও কষ্টের মধ্যে কেহ তাঁহাকে চক্ষুর জল ফেলিতে দেখিত না। কেবল এক দিন তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। নীলরতন রুই মাছের মুড়া খাইতে বড় ভালবাসিত। অবস্থা পরিবর্ত্তনের পর হইতে তাঁহাদের বাড়ীতে আর বড় মাছ আসে নাই। পয়সা দিয়া ত মাছ কিনিবার সাধ্য নাই, যদি কখনও মাছ কেনা হয়, তবে সে এক আধ পয়সার চুনা পুঁটী মাত্র। একদিন সন্ধ্যার পর নীলরতন আহার করিতে বসিয়াছে, তাহার জননী তাহাকে খাইতে দিয়া সম্মুখে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। সেদিন ছোট ছোট পুঁটী মাছ রান্না হইয়াছিল। নীলরতন তারই মুড়া চুসিয়া চুসিয়া খাইতে খাইতে বলিল, "রুই মাছের মুড়ার মত লাগিতেছে।" এই কথা শুনিয়া তাহার মার চোখে

জল আসিল। মায়ের প্রাণ! তাঁহাদের ভাল দিনে বড় বড় রুই মাছ পরকে দিয়াছেন; আজ তাঁহার সন্তান একটু মাছের জন্য লালায়িত! তিনি ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,"বাবা, আমার এই হাতের কাঁথাখানি শেষ হইলেই তোমাকে সেই পয়সায় আমি রুই মাছ খাওয়াইব।"

এত দুঃখের মধ্যেও তিনি এই আশায় বুক বাঁধিয়া আছেন যে, নীলকমল পড়িতেছে। সে মানুষ হইলেই তাঁহাদের সকল দুঃখ ঘুচিবে। যেদিন নীলকমলের চিঠিতে জানিলেন যে, তাহাদের সকল বন্দোবস্ত ঠিক্ হইয়াছে, রামচরণের চাকরী হইয়াছে এবং তাহার পড়া বন্ধ হইবার আর ভয় নাই, সেদিন তিনি অকূল পাথারে যেন কূল পাই-লেন। তাঁহার মনে হইল, এখন তিনি সকল কষ্টই সহ্য করিতে পারেন। সপ্তাহে সপ্তাহে নীলকমলের চিঠি আসিত। সাত দিন তিনি সেই চিঠির অপেক্ষায় সতৃষ্ণ নয়নে বসিয়া থাকিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহার কল্যাণের জন্য ঠাকুর দেবতার কাছে কত

প্রার্থনা করিতেন। মায়ের এই কাতর প্রার্থনা ভগবান শোনেন না, ইহা কখনই হয় না।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সুহৃদ-লাভ।

এদিকে কৃষ্ণনগরেও নীলকমলের দিন সুখে যাইতেছিল না। মেসে নানা রকমের ছেলে। অনেকেই নীলকমলকে উপেক্ষার চক্ষে দেখে। নীলকমল ভাব বুঝিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিতে চাহিত না। সে আপন মনে আপনার পড়া লইয়াই থাকিত। চিরদিনই তাহার লেখাপড়ায় খুব যত্ন ছিল; এখন আবার দুরবস্থায় পড়িয়া তাহার পাঠে যত্ন দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। নীলকমল বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহাকে বৃত্তি পাইতেই হইবে। তাহার ইচ্ছা যে, বৃত্তি পাইলেই নীলরতনকে কৃষ্ণনগরে আনিয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবে ও বাড়ীতে কিছু কিছু টাকা পাঠাইবে। প্রতি পত্রেই নীলকমল মাকে লেখে, "মা, তোমাদের কেমন

করিয়া চলিতেছে ? কোনও কষ্ট হইতেছে না ত ?” তাহার মা উত্তর দেন, “আমাদের এক রকম করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তুমি সে জন্য ভাবিওনা।” নীলকমল এখানে থাকিয়া বুঝিতে পারিতেছেনা, এক রকম করিয়া চলার অর্থ কি ! রামচরণ বেতন হিসাবে যে দুইটী করিয়া টাকা পাইত, তাহা হইতে নীলকমলের জন্য বিকালে দুই পয়সার করিয়া জল-খাবার আনিতে চাহিল। কিন্তু নীলকমল কিছুতেই সম্মত হইল না, বলিল, “বিকালে আমার ক্ষুধা পায় না। তার পরে আমাদের ধোপা, কাপড়, তৈল ইত্যাদি লাগিবে ত ? দুই টাকার একটা যদি জলখাবারেই যায়, তবে এ সকল খরচ চলিবে কি প্রকারে ?” রামচরণও তাহা বুঝিত। কিন্তু নীলকমল ছেলেমানুষ, দশটার সময় ভাত খাইয়া স্কুলে যায়, সারাদিন স্কুলে পড়ে। আবার রাত্রি দশটার সময় ভাত খাইতে পায়। মাঝে একবার একটু কিছু না খাইলে পারিবে কেন ? তার পরে ঠিক হইল, যে দিন তাহার ক্ষুধা লাগিবে, সে দিন

সে নিজেই বলিবে ও জলখাবার আনিয়া খাইবে, কিন্তু ক্ষুধা ত তার রোজই পায়। তবু রামচরণকে কিছু বলেনা, চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু ক্ষুধার কষ্ট অপেক্ষা আর এক কষ্ট নীলকমলের প্রাণে অধিক লাগিত। মেসের ছেলেরা তাহার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিত না। সে নীরবে সব সহ্য করিত, কিন্তু তাহার প্রাণে বড়ই লাগিত। মেসে আসিয়াই দেখিল যে, তাহাদের ক্লাসের একটী ছেলে সেই মেসে থাকে। দেখিয়া তাহার মনে আনন্দ হইল। ভাবিল যে, তাহার নিজের যে সব বই নাই, ইহার নিকট হইতে সময়ে সময়ে তাহা লইয়া পড়িবে। কিন্তু দুই এক দিনেই তাহার সে ভ্রম দূর হইল। ছেলেটি যখন শুনিল যে, নীলকমল তাহাদের মেসে থাকিয়া পড়িবে, রামচরণের বেতনের টাকা হইতে তাহার খরচের টাকা কাটা যাইবে, তখন তাহার আত্মাভিমান জাগিয়া উঠিল। নীলকমলকে দেখিলে সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়। নীলকমল তাহার ভাব বুঝিয়া বড় একটা তাহার কাছে যাইত না।

একদিন সন্ধ্যাকালে নীলকমল তাহার কাছে একখানি বই চাহিতে গেল। ঐ ছেলেটি তখন আলো জ্বালিয়া বই লইয়া বসিয়া আছে। নীলকমল কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তবু সে যেন তাহাকে দেখিতে পায় নাই, এমনি করিয়া থাকিল। তার পরে নীলকমল দুই তিনবার বই চাওয়ার পর ছেলেটি বলিল যে, সে বই দিতে পারিবে না। নালকমল আর কিছু না বলিয়া ফিরিয়া আসিল।

ইহার পর স্কুলে যাওয়ার সময় খাওয়া লইয়া গোলমাল। নীলকমল যে তাহাদের সঙ্গে একত্র বসিয়া খায়, সে বড় তাহা পছন্দ করে না। নীলকমল তাহা বুঝিতে পারিল। সে রামচরণকে বলিল। যে ব্রাহ্মণটী রাঁধিত, সে রামচরণের উপর খুব সন্তুষ্ট, রামচরণকে কিছু বলিতে হয় না, আপন মনে অতি পরিপাটীরূপে সকল কাজ করিয়া যায়। নীলকমলের বিষাদপূর্ণ অথচ সুন্দর মুখখানি দেখিয়াও তাহার প্রতি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক স্নেহ জন্মিয়াছিল। সে রামচরণকে বলিল, "কিছু ভয় নাই, আমি বাবুকে

তোমার ঘরে সকলের আগে খাবার দিয়া আসিব।”

এই রকম ছোট ছোট বিষয় লইয়া ঐ ছেলেটা নীলকমলকে বড়ই উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। নীলকমলের জন্য সময়ে সময়ে রামচরণকেও বড় বিরক্ত করিত। কিন্তু রামচরণের কাজে সকলেই খুব সন্তুষ্ট, তাহার কোনও দোষ ত্রুটী পায় না, সুতরাং কি করিবে! বাসায় কোনও কোনও ছেলে নীলকমলকেও খুব ভালবাসিত। কিন্তু যদি একজনও ঘৃণা বা উপেক্ষা করে, তাহাতেও আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন মানুষের প্রাণে বড়ই লাগে। সেই জন্য নীলকমলের এ বাসায় থাকিতে ভাল লাগিত না। সে অনেক সময় তাহার বন্ধু যতীন্দ্রের বাড়ীতে গিয়া পড়িত। সেখানে তাহার বইএরও সুবিধা হইত, পড়িবারও সুবিধা হইত। সকালে উঠিয়াই সে সেখানে যাইত, আবার সন্ধ্যার সময় গিয়া রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত পড়িয়া আসিত।

একদিন সন্ধ্যার পরে নীলকমল ও যতীন্দ্র তাহার

ঘরে বসিয়া পড়িতেছে। এমন সময় যতীন্দ্রের মা সেখানে আসিলেন। যতীন্দ্র অনেক সময় তাহার মায়ের নিকট নীলকমলের প্রশংসা করিত। তিনি সেদিন বিকালে বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা, সে ছেলেটিকে একদিন দেখাস্ ত।" যতীন্দ্র বলিল "সে রোজই আমাদের এখানে প'ড়িতে আসে। কিন্তু তাহাকে যদি বলি, তুমি তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছ, তাহা হইলে সে হয় ত দেখা করিতে চাহিবে না। তুমি আজ সন্ধ্যাকালে আমরা যখন আমার নীচের ঘরে বসিয়া পড়িব, তখন আসিও; তাহাকে দেখিতে পাইবে।" বিকালে এই কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তাই সন্ধ্যাকালে যতীনের মা তাহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যতীন তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "মা, তুমি আমাদের পড়া দেখিতে আসিয়াছ? কমল, আমার মা তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে এখানে আসিতে ব'লিয়াছিলাম।"

নীলকমলের বড় লজ্জা হইল। তবু আস্তে

আস্তে উঠিয়া সে যতীনের মাকে প্রণাম করিল। তিনি একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, "যতীন তোমার অনেক প্রশংসা করে, তোমার সঙ্গে ওর খুব ভাব, তাই আমি তোমাকে দেখিতে আসিলাম। তুমি কোথায় থাক ?"

নীলকমল বলিল, "এখান হইতে একটু দূরে একটা মেস আছে, আমি সেখানে থাকি।" যতীনের মা নীলকমলের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমার মুখ এত শুখ্‌নো দেখাইতেছে কেন ? বিকালে কি খাইয়াছ ?"

মায়ের চোখ! তিনি এক নিমেষেই ধরিয়া ফেলিলেন যে, ছেলেটার মুখ বড় শুষ্ক। নীলকমল বড় অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বিকালে আমার ক্ষুধা পায় না।"

যতীনের মা। তুমি কি স্কুল হইতে আসিয়া কোনও দিন কিছু খাওনা ?

নীলকমল। না।

যতীনও জানিত না যে, নীলকমল বিকালে জল-

খাবার খায় না। সে একেবারে চমকিয়া উঠিল, বলিল, "তুমি বিকালে জলখাবার খাওনা ?"

যতীনের মা তাহাকে বকিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তোর মত ভূত ত আমি কোথাও দেখি নাই, বাছার আমার মুখ শুকাইয়া আমচুর হইয়া গিয়াছে। তুই রোজ দেখিস্, তোর চোখ থাকে কোথায় ? একদিন জিজ্ঞাসাও করিতে হয় না ? মায়ের কাছ হইতে দূরে ছেলে পাঠান ঝকমারি। দেখ ত, এই দুধের ছেলে সেই সকালে সন্ধ্যায় খেয়ে থাকে, বিকালে মুখে একটু জলও দেয়না। তুমি বস, আমি এখনি তোমার জন্য খাবার আনিতেছি।" এই বলিয়া তিনি বাড়ীর ভিতরে গেলেন। নীলকমল যতীনকে বকিতে লাগিল··· কেন সে মাকে তাহার কথা বলিল ? যতীন তাহাকে বকিতে লাগিল, কেন সে বিকালে জলখাবার খায় না ? ইতিমধ্যে যতীনের মা কিছু জলখাবার লইয়া আসিলেন এবং নীলকমলের কোনও আপত্তি না শুনিয়া তাহাকে সেগুলি

খাওয়াইলেন, তৎপরে বলিলেন, "তুমি স্কুল হইতে ফিরিবার সময় রোজ যতীনের সঙ্গে এখানে আসিবে। তৎপরে রাত্রিতে পড়িয়া একবারে তোমাদের মেসে যাইও।"

নীলকমল তখন কিছু উত্তর দিল না। মনে মনে স্থির করিল, কাল হইতে সে আর সেখানে পড়িতেই আসিবে না।

পরদিন স্কুলের ছুটির সময় গোলমালের মধ্যে সে যে কোন দিকে সরিয়া পড়িল, যতীন তাহাকে দেখিতে পাইল না। যতীন এদিকে ওদিকে অনেক খুঁজিয়া বাড়ী ফিরিল। তাহার মা দুজনার জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি নীলকমলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "সে এখানে আসিতে হইবে ভয়ে ছুটীর সময় কোন দিক দিয়া পলাইয়া গিয়াছে। আমি তাহাদের মেসে যাই, তাহাকে না লইয়া আমি ফিরিব না। ও বড় লাজুক, তুমি ওকে একটু আপনার করে নাও, নইলে ও কিছু খাইতে চাবে না।" যতীনের মা

বলিলেন, "আচ্ছা তুই তাকে একবার নিয়ে আয় ত। আর মেসে সে কেমন থাকে, কি খায়, সব আস্তে আস্তে জান্ ত। ছেলেটি বড় ভাল। মুখে কথাটি নাই। দেখ্ ত, সারা দিন না খাইয়া সন্ধ্যাকালে এখানে পড়িতে আসে।"

যতীনকে আর কিছু বলিতে হইল না। সে বই রাখিয়াই নীলকমলের মেসের দিকে ছুটিল। সেখানে গিয়া দেখে যে, নীলকমল বারান্দায় বসিয়া পড়িতেছে। যতীন তাহাকে বলিল, "দুষ্ট, তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া আসিয়াছ। মা তোমাকে ডাকিতেছেন। আমার উপর তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার হুকুম আছে।"

নীলকমল বলিল "না ভাই, আমার যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না, তোমার দুখানি পায় পড়ি, আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

যতীন বলিল, "আচ্ছা তবে থাক; আমিও যাব না, আমিও কিছু খাব না।"

তখন নীলকমল বাধ্য হইয়া যতীনের সঙ্গে সঙ্গে

চলিল। যতীন তাহকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু সে কিছুতেই যাবে না। তখন তাহার মাকে খবর দিল। যতীনের মা দুই হাতে দুটি খাবারের রেকাব লইয়া সেখানে আসিলেন, বলিলেন, "তুমি স্কুলের পরে এলে না কেন? লজ্জা কি? যতীন যদি তোমাদের দেশে যায়, তাহা হইলে তোমার মা খেতে দিলে কি সে খায় না? তুমি যদি না এস, তাহা হইলে আমি বড় দুঃখিত হইব। তুমি বিকালে জলখাবার খাও নাই জানিয়া কি আমি স্থির থাকিতে পারি। এবার যখন বাড়ী যাবে তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করিও, কি আপনার ছেলে কি পরের ছেলে, কেহ অভুক্ত আছে জানিলে মায়ের মন কেমন করে। তোমরা দুই বন্ধুতে আসিয়া যদি একত্র আমার কাছে খাও, তাহাতে আমার কত সুখ হবে আর ঈশ্বর-ইচ্ছায় আমি তাতে গরীব হয়ে যাবনা।"

নীলকমল আর কোনও উত্তর দিতে পারিল না। এখন হইতে প্রতিদিনই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় স্কুলের

পর যতীনের সঙ্গে তাহাকে তাহাদের বাড়ীতে আসিতে হইত। কয়েক দিনেই যতীনের মা তাহাকে বশ করিয়া লইলেন। ভালবাসায় কে না বশ হয় ? বিশেষতঃ নীলকমল মা ও বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যাকুল ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

শত্রুবৃদ্ধি।

এখন হইতে নীলকমল অনেক সময়ই যতীনদের বাড়ীতে কাটাইতে লাগিল। মেসে পড়ার সুবিধা হইত না, তা ছাড়া সেখানে তাহার ভালও লাগিত না। মধ্যে আবার একটা ঘটনা হয়, তাহাতে নীলকমলের পক্ষে সেস্থান আরও অধিক অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। ক্লাশের সেই বাবু ছেলেটি মেসে নীলকমলকে অবজ্ঞা করিত, কিন্তু ক্লাশে গিয়া তাহাকে সম্মান করিত, ক্লাশের শিক্ষকেরা নীলকমলকে ভালবাসেন, ছেলেরা সকলেই

তাহার অনুগত, সুতরাং সেখানে নীলকমলেরই প্রতিপত্তি। ইহাতে সেই বাবু ছেলেটি মনে মনে নীলকমলের উপর আরও রাগিত। ক্লাশে তাহার সঙ্গে পারিত না, তাই বাড়ীতে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার শোধ লইত। ইহার পরে এক দিন স্কুলে পণ্ডিত মহাশয়ের ক্লাশে পড়া হইতেছে, পণ্ডিত মহাশয় বৃদ্ধ, সেকেলে লোক. তিনি ছাত্রদিগকে খুব ভাল বাসিতেন, তবে সেকেলের ধরণ অনুসারে সময়ে সময়ে তাহাদিগকে খুব বকিতেন। এজন্য ছেলেরা তাঁহাকে বড় ভয় করিত। তাঁহার পড়া না পড়িলে তিনি এমন চিমটি-কাটা কথা শুনাইতেন, যে সকলে আর কিছু হউক না হউক, সর্ব্বাগ্রে পণ্ডিত মহাশয়ের পড়া করিয়া আসিত। অবশ্য কতকগুলি ছেলের পড়া কখনই তৈয়ারি হইত না। নীলকমলদের মেসের বাবু ছেলেটী তাহাদের মধ্যে একজন। পণ্ডিত মহাশয় অনেক করিয়াও তাহাকে ঠিক করিতে পারেন নাই। একদিন পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে

পড়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে পারিল না, আর একটী প্রশ্ন ক'রিলেন, তাহাও পারিল না। নীলকমল সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিল। পণ্ডিত মহাশয়ের তখন খুব রাগ হইয়াছে। নীলকমলকে বলিলেন, "উহার কান মলিয়া দাও।" নীলকমল ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন পণ্ডিত মহাশয় আরও রাগিয়া বলিলেন, "আমি বল্‌ছি, এখনই উহার কান মলিয়া দাও।" নীলকমল আর কি করে,-আস্তে আস্তে গিয়া তাহার কানটী ছুঁইল মাত্র। নীলকমলের ইচ্ছা ছিল না বটে, কিন্তু মনে মনে ঐ ছেলেটির উপর রাগও ছিল। সে নীলকমলকে নানা সময়ে নানা প্রকারে এত অপমান করিয়াছিল, আজ তাহার পরিশোধ দিবার সুবিধা পাওয়াতে তাহার মনে একটু আনন্দও হইয়াছিল। কিন্তু ফল এই হইল, যে, সে নীলকমলের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল। সেই দিন হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যে প্রকারে পারে, নীলকমলকে তাহাদের বাসা হইতে তাড়াইবে।

ইহার পর হইতেই নীলকমলও রামচরণের উপর তাহার অত্যাচারের মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া গেল। নীলকমল বুঝিতে পরিল, যে সে বাসায় আর তাহার পক্ষে বেশী দিন থাকা সম্ভব হইবে না। তখন রামচরণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিল, যে, কি করা যায়। রামচরণ অন্যত্র চাকরীর চেষ্টা দেখিতে লাগিল। যতীনও জানিতে পারিল। কিছু দিন হইতে তাহার মায়ের পরামর্শ মত যতীন নীলকমলের বাসার সমস্ত সংবাদ লইতেছিল। অনেক অসুবিধা ও লাঞ্ছনার মধ্যে নীলকমল যে এই বাসাতে থকে, যতীন তাহা জানিত। তাহার পর এখন যে তাহা আরও বাড়িল, সে তাহা বুঝিতে পারিল। সেই দিনই রাত্রিতে যতীন তাহার মাকে স্কুলে যাহা ঘটিয়াছিল, সমুদায় বলিয়া কহিল, "নীলকমলকে কেন আমাদের বাড়ী রাখ না? আমরা দুজনে এক ঘরে থাকিব; কোনই অসুবিধা হইবে না।"

যতীনের মা বলিলেন, "ওকি থাকিতে সম্মত

হইবে? তুই একটু আঁচিয়া দেখিস্ ত। আমিও ও বিষয়ে ভাবিব।”

যতীনের মার মনে সে প্রশ্ন সেদিন প্রথমে উঠে নাই। নীলকমলকে দেখিয়াই তাঁহার মনে তাহার প্রতি স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। সুন্দর টুকটুকে ছেলেটী, স্বভাব চরিত্র কেমন শান্ত ও মধুর, তাহার উপরে লেখা পড়ায় কত ভাল। এমন ছেলের প্রতি ভালবাসা সকল রমণীর পক্ষেই স্বাভাবিক। যতীনের মা প্রথমেই নীলকমলকে সস্নেহে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিন যাইতে না যাইতে তাঁহার মনে আর একটী চিন্তা আসিয়া ছিল। যতীনের একটী ছোট বোন ছিল। তাহার বয়স সবে নয় বৎসর হইয়াছে মাত্র। যতীনের বাবা মোক্তারি করেন; সে সময়ে মোক্তারিতেও অনেক পয়সা ছিল। অনেক দিন হইতে মোক্তারি করিয়া তাঁহার বেশ পসার হইয়াছিল, যথেষ্ট অর্থও সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেবল মাত্র এক ছেলে ও এক মেয়ে। একটী মাত্র মেয়ে বলিয়া তাহার

বিবাহের কথা এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনে আসে নাই। বিশেষতঃ যতীনের বাবা মেয়েটীকে বড় ভাল বাসিতেন; কাছারী হইতে আসিয়া আগে মেয়েটীকে না দেখিলে তাঁহার মন সন্তুষ্ট হইত না। এই জন্য তাঁহারা ঠিক করিয়াছিলেন, যে যত দিন পারা যায়, কন্যার বিবাহ দিবেন না। নীলকমলকে দেখিয়া যতীনের মায়ের মনে হইয়াছিল, যদি এমন একটী ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে পারেন, এবং তাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া পড়াইতে পারেন, তাহা হইলে বেশ হয়। তিনি মনে ভাবিতেছিলেন, যে নীলকমলের সঙ্গে কি তাঁহাদের মেয়ের বিবাহ হইতে পারে না। সেই রাত্রিতেই স্বামীকে আপনার মনের ভাব জানাইলেন এবং স্থির হইল, যে নীলকমলের সঙ্গে তাঁহাদের কন্যার বিবাহে কোনও আপত্তি আছে কি না গোপনে গোপনে তাহা জানিতে হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

আত্মসম্মান বোধ।

ক্রমে নীলকমলদের পক্ষে সেই মেসে থাকা অসম্ভব হইল। ছেলেটীর অত্যাচার এতই বাড়িয়া গেল, যে অন্যত্র যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। এমন সময়ে এক দিন বিকালে যতীন একথা ও কথা সে কথার মধ্যে নীলকমলকে বলিল, "ভাই, তুমি যদি আমাদের বাড়ীতেই থাক, তাহা হইলে বেশ হয়, আমাকেওএত দূর আসিতে হয় না, তোমাকেও যাইতে হয় না। আর আমার পড়ারও সুবিধা হয়।" যতীন এমন ভাবে কথাটা পাড়িল, যে, ইতিপূর্ব্বে যে সে এই প্রস্তাবের কথা ভাবিয়াছে, তাহা মনে হয় না, কিন্তু নীলকমল অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী। সে সহজেই বুঝিতে পারিল, যে প্রস্তাবটি তখনই যতীনের মাথায় যোগায় নাই। তাহার ভিতরে নিশ্চয়ই কথা আছে এবং যতীন নিজের সুবিধার জন্য এ প্রস্তাব করে নাই, তাহার

উপকার করাই যে যতীনের উদ্দেশ্য, নীলকমলের ইহা বুঝিতে বাকী রহিল না। নীলকমল বাস্তবিকই যতীনকে ভালবাসে, কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ আত্মসম্মান জ্ঞান যতীনের নিকট হইতেও অনুগ্রহ লইতে চাহে না। তাহার পর শুধু ত যতীন একা নহে, যতীনের মা, বাপ বোন ও অন্যান্য আত্মীয়েরা আছেন; তাঁহাদের সকলের মধ্যে গিয়া বাস করিতে হইবে। নীলকমল কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। যতীন অনেক অনুনয় বিনয় করিল, অভিমান করিল। কিন্তু নীলকমল কিছুতেই স্বীকৃত হইল না, এখানে নীলকমল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বরং লেখা পড়া ছাড়িয়া দিবে, কিন্তু অপরের গলগ্রহ হইবে না এই তাহার সংকল্প। যতীনকে সে সকল কিছু বলিল না। কেবল মাত্র বলিল, "তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমাদের বাড়ীতে থাকিতে পারিব না। যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে তোমাকে অত বলিতে হইত না।" যতীন আর কি বলিবে? সে অতিশয় ক্ষুণ্ণমনে তাহার মাকে যাইয়া বলিল, নীলকমল

কিছুতেই তাহাদের বাড়ীতে থাকিতে সম্মত হইল না। তিনি বলিলেন, "আমি ত বলিয়াছিলাম। আমি তাহার প্রকৃতি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম, যে ও আমাদের বাড়ীতে থাকিতে সম্মত হইবে না। আচ্ছা যেখানেই থাক, যাহাতে উহার বেশী কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিও।"

নীলকমল যতীনদের বাড়ীতে যাইতে সম্মত লইল না, কিন্তু মেসে থাকাও আর চলে না। এখন অন্য উপায় দেখা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। রামচরণ কয়েক দিন অন্য কোনও মেসের সন্ধান দেখিল, কিন্তু কোথাও এ রকম বন্দোবস্তের সুবিধা হইল না। তখন অগত্যা এই ঠিক করিল, যে কোথাও সামান্য ভাড়া দিয়া একটা ঘর লইবে, এবং নীলকমল হোটেল হইতে খাইয়া আসিবে তাহাতে অল্প খরচ পড়িবে, আর রামচরণ যেখানে সুবিধা হয়, কাজ করিবে দিনান্তে সে নীলকমলের কাছে আসিয়া থাকিবে, সেই প্রকারই বন্দোবস্ত হইল। ক্রমে নীলকমলের পরীক্ষার দিন নিকট

হইতে লাগিল। সে অধিকতর পরিশ্রম করিয়া পড়িতে লাগিল। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও প্রতিদিন বিকালে স্কুলের পর যতীনের সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে যাইতে হইত। রাত্রে যতীনের মা সেখানেই রাখিতেন। তাহাতে বাস্তবিকই তাহাদের পড়ার সাহায্য হইত, যতীনের মা আসিয়া অনুরোধ করিলে নীলকমল তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিত না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

আঁধারে আলোক।

এত দিন পরে নীলকমলের পথ পরিষ্কার হইতে লাগিল। সে সম্মুখে আলোক দেখিতে পাইল। বৎসরের শেষে নীলকমল পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিল ও মাসিক পনর টাকার বৃত্তি পাইল। প্রথম মাসের টাকা পাইয়াই নীলকমল তাহা হইতে পাঁচ টাকা তাহার মাতার কাছে পাঠাইয়া দিল। দারিদ্র্যের মধ্যে প্রথম উপার্জ্জিত অর্থ যে কত

মূল্যবান মনে হয়, তাহা যে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছে, সেই জানে। মানুষ পরবর্ত্তী জীবনে হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু বহু দিনের সংগ্রামের পরে প্রথম যে পাঁচটী টাকা পায়, তাহাতে তাহার যে আনন্দ হয়, পরের পাঁচ হাজারেও তাহা হয় না। যে দিন নীলকমল প্রথম মাসের বৃত্তির পনরটী টাকা পাইল, সে দিন কলেজ হইতে আসিতে আসিতে তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল। তাহার মন আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাকালে রামচরণ কাজ করিয়া ফিরিলে নীলকমল তাহার হাতে টাকা কয়টী দিয়া বলিল, "চরণ দাদা, আজ আমার বৃত্তির টাকা পাইয়াছি। বাবার মৃত্যুর দিনে ভাবি নাই, যে দুঃখের দিন অবসান হইবে। আজ যে এই সুখের মুখ দেখিতে পাইলাম, তুমিই তাহার কারণ। এই আমার প্রথম উপার্জ্জন, এখন হইতে আমি যে দিন যাহা উপায় করিতে পারিব, সব আনিয়া তোমারি হাতে দিব, তুমি তাহা তোমার ইচ্ছা মত ব্যয় করিবে।" বলিতে বলিতে নীলকমল

কাঁদিয়া ফেলিল, রামচরণও কাঁদিল। সন্ধ্যার আঁধারে সেই দুইটী সরল হৃদয়ের অশ্রুবর্ষণ দেবতা কি করুণ নেত্রে দেখিলেন না?

নীলকমল তখন রামচরণকে বলিল, "তোমার এখন কাজ না করিলেও চলিবে। পনর টাকাতেই আমাদের দু'জনের চলিতে পারে।" রামচরণ বলিল, "সেকি হয়? যত দিন আমার শরীরে শক্তি আছে, আমি কাজ করিব। তাহার পরে এখন নীলরতনকে আনিতে হইবে। এত দিন তাহার পড়া বন্ধ রহিয়াছে। বাড়ীতে কিছু কিছু টাকা পাঠাইতে হইবে। মা যে কেমন করিয়া চালাইতেছেন, তাহা ত ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না।" নীলকমল বলিল, "তুমি যদি বল, তবে কিছু টাকা কালই পাঠাইয়া দিই। আমারও ত ইচ্ছা, যে নীলরতনকে আনি, তবে তোমাকে যে আর পরের বাড়ীতে খাটিতে হয়, সে আমার ভাল লাগে না।" দুই জনে অনেক পরামর্শের পর ঠিক করিল, যে, তাহার পর দিন বাড়ীতে টাকা পাঠাইয়া দিবে, আর

কিছু দিনের মধ্যে সুবিধা পাইলে রামচরণ একবার বাড়ী গিয়া নীলরতনকে লইয়া আসিবে।

পর দিন সকালে উঠিয়াই নীলকমল মাতাকে পত্র লিখিল,

শ্রীচরণেষু,

মা, কাল আমার প্রথম মাসের বৃত্তির পনর টাকা পাইয়াছি। তাহার পাঁচ টাকা তোমাকে পাঠাইতেছি, তুমি তোমার ইচ্ছা মত খরচ করিও। সকল টাকাই খরচ করিও। সমুদয়ই পাঠাইতাম, কিন্তু চরণ দাদা বলিল, যে শীঘ্র নীলরতনকে আনিতে হইবে। এত দিনে যে নীলরতনের পড়ার সুবিধা হইল, ইহাতে আমার বড় আনন্দ হইতেছে। আমরা যদি তোমাকে আবার সুখী করিতে পারি, তবেই জীবন সার্থক মনে করিব। কত কাল যে তোমাকে দেখি নাই। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় তোমার আশীর্ব্বাদ আমার মস্তকের উপর অনুভব করি এবং তাহাই আমাকে সকল অবস্থায় শক্তি এবং সাহস দেয়। পৃথিবীতে মায়ের আশীর্ব্বাদের মত

পবিত্র বস্তু আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি যেন তাহাই অবলম্বন করিয়া জীবন পথে চলিতে পারি।

তোমার স্নেহের
কমল।

যথা সময়ে নীলকমলের প্রেরিত টাকা ও পত্র তাহার মায়ের হস্তগত হইল। সে দিন আবার বিধবার সমুদ্র তুল্য শান্ত হৃদয়ে শোকের ঝড় নূতন করিয়া বহিল। আনন্দের দিনে শোকের স্মৃতি বড় লাগে। নীলকমলের মা গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেদিন অনেকক্ষণ অশ্রু জলে ভাসিলেন। বিধবার দিন বড় দুঃখেই কাটিয়াছে। আজ তাঁহার কাছে পাঁচটী টাকা পাঁচটী মোহরের মত মনে হইতে লাগিল। কিন্তু ইহা সংসারের খরচে লাগাইতে তাঁহার একবারও ইচ্ছা হইল না। তিনি তিনটী টাকা সিন্দূর মাখাইয়া একটী কৌটার মধ্যে রাখিয়া দিলেন, আর বাকী দুইটি পূজার ব্যয়ের জন্য তাঁহাদের পুরোহিতের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নূতন পরামর্শ।

পাশ হইয়া বৃত্তি পাওয়াতে নীলকমলের যে আনন্দ হইয়াছিল, একটি কারণে সে আনন্দ কিছু ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। সেটি এই যে, তাহার বন্ধু ও সঙ্গী যতীন পাশ হইতে পারে নাই। যতীন অতি শান্ত এবং সৎ ছেলে, কিন্তু তাহার বুদ্ধিটা কিছু মোটা রকমের ছিল। পাশ না হওয়াতে নীলকমলের তাহার অপেক্ষা বেশী কষ্ট হইয়াছিল। নীলকমল মনে করিতে লাগিল যে, সে যদি যতীন-দের বাড়ীতে থাকিত, তাহা হইলে হয়ত যতীনকে বেশী সাহায্য করিতে পারিত এবং সে পাশ হইত। তাই মনে মনে ঠিক করিল, যে, এবার যতীনের পড়ায় সে খুব সাহায্য করিবে। এ বৎসর সেই জন্য নীলকমল অনেক সময় যতীনদের বাড়ীতে থাকিত। এখন যতীনদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাইতে আর তাহার তত সঙ্কোচ বোধ হইত না।

কারণ এবার তাহার তত অর্থের অভাব নাই। যাহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান প্রখর, তাহারা যতক্ষণ অপরের করুণার প্রয়োজন, ততক্ষণই অপরের নিকট উপকার লইতে কুণ্ঠিত হয়। নীলকমল পাশ হওয়ায় পর হইতে যতীনদের পরিবারের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা ক্রমে বাড়িয়া গেল। যতীনের মা নীল-কমল বৃত্তি পাওয়াতে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কেবল অর্থের জন্য যে এই আনন্দ, তাহা নহে। নীলকমলের প্রতি তাঁহার একটা মমতা জন্মিয়াছিল ; তৎপরে তাহাকে ভাবী জামাতা করিবার আশাও অবশ্য তাঁহার মনে মনে ছিল! এখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া এই সম্বন্ধ ঠিক করা যায়। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, যে যতীনকে তাঁহার পরামর্শের মধ্যে না লইলে অন্য উপায় নাই। সুতরাং এক দিন বিকালে নানা কথার মধ্যে বলিলেন, "দেখ, উষার সঙ্গে তাদের নীলকমলের বিয়ে দিলে কেমন হয়?"

যতীন এই কথা শুনিয়া থতমত খাইয়া গেল।

এ সম্ভাবনাটা কখনও তাহার মনের মধ্যে আসে নাই। কিন্তু মা যখন বলিলেন, তখন তাহার বড় ভাল লাগিল। সে আনন্দে বলিয়া উঠিল, "ওমা, তা'হলে কি সুন্দরই হয়!"

মা বলিলেন, "কিন্তু নীলকমল কি রাজী হবে? ও বড় একগুঁয়ে ছেলে। আমার বড় ভয় হয়। কি করিয়া ওকে বলা যায় বল দেখি? হঠাৎ কিছু বলা হবে না, তাহ'লে সে আর এদিকে পা দিবে না।"

যতীন। আমারও তাই মনে হয়। আমি তাকে কিছু বলিতে পারিব না। কিন্তু দাঁড়াও. এক কাজ করিলে হয়। নীলকমল তার চরণ-দাদার বড় বাধ্য। সে যা বলে তাই শুনে, তাকে দিয়ে এ কাজটা করিতে পারিলে ভাল হয়।

মা। এ তুই বেশ বুদ্ধি দিয়াছিস্। তুই এক দিন তাকে আমার কাছে ডাকিয়া আন দেখি। আমি আজই তা'হলে তার সঙ্গে কথা বলি।" যতীনের কি আর এক দিনের দেরী সহ্য হয়? সে

বলিল, "আমি আজই তাকে ডাকিয়া আসিতে চলিলাম।"

সেইদিন সন্ধ্যার পর রামচরণ কাজ করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর, যতীন তাহাকে চুপিচুপি বলিল, "মা তোমাকে একবার আমাদের বাড়ীতে যাইতে বলিয়াছেন।"

রামচরণ নীলকমলের খোজে মাঝে মাঝে যতীনদের বাড়ী গিয়াছে, কিন্তু আজ হঠাৎ যতীনের মা কেন ডাকিতেছেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে রাত্রিতে না যাইয়া পর দিন ছুপুরে যাইবে বলিল।

পর দিন ছুপুরে কাজ কর্ম্মের পর রামচরণ যতীনদের বাড়ী গেল। যতীন সেদিন উৎসাহ ও ঔৎসুক্যে আর স্কুলে যায় নাই। রামচরণ আসিতেই তাহাকে মার কাছে লইয়া গিয়া সে অন্য একটা ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। যতীনের মা তখন নানা কথা পাড়িলেন। নীলকমল পাশ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে বলিয়া তিনি কত সুখী হইয়াছেন, এমন

ছেলে হয় না, নীলকমলের মায়ের কি সৌভাগ্য ইত্যাদি। এইরূপ নানা কথাবার্ত্তার পর আসল কথা আসিল। তিনি বলিলেন, "দেখ, তোমাকে আমি আজ একটী কথার জন্য ডাকিয়াছি, কিন্তু আর কাহাকেও কিছু বলিও না। তুমি ত আমার মেয়ে উষাকে দেখিয়াছ। মা হয়ে মেয়ের গুণের কথা বলিতে নাই, কিন্তু অমন নিখুঁত মেয়ে আর হয় না। এমন ননীর পুতুল মেয়েটী কার বাড়ী যে যাবে। যদি নীলকমলের হাতে তাহাকে দিতে পারিতাম, তবে আমার কোনও ভাবনা ছিল না।"

রামচরণ উষাকে দেখিয়াছে। উষার সঙ্গে নীলকমলের যে বিবাহ হইতে পারে, এ কথাটা তার মনে কোনও দিন আসে নাই। তবে সে অনেক সময়ে নীলকমলের জন্য যে স্ত্রী কল্পনা করিত, তাহা উষারই অনুরূপ। রামচরণ শৈশবাবধি পিতৃ মাতৃহীন। তাহার মা বাপ গৃহ পরিবার কিছুই ছিলনা। নিজের জন্য সে কোনও সুখই কল্পনা করিত না। তাহার সকল সুখ এই পরিবারের সঙ্গেই জড়িত হইয়াছিল।

অবসর সময়ে বসিয়া সে কতদিন ভাবী সুখের কল্পনা করিয়াছে। পৃথিবীতে এমন মানুষ কেহ নাই, যে সম্মুখে সুদিনের কল্পনা করে না। দীনতম ভিখারী, কারাগারে শৃঙ্খলিত অপরাধী, সে ভাবে, হয়ত এক দিন ঐশ্বর্য্য আসিবে, মুক্তি পাইবে। রামচরণও কল্পনা করিত। তাহার সুখের কল্পনাতে সে নিজের জন্য ধন, মান সম্পদ কিছুই দেখিত না। সে কল্পনা করিত, নীলকমল বড়লোক হইয়াছে, তাহার বড় চাকরী হইয়াছে, মান যশ হইয়াছে, বিবাহ করিয়া সুখে গৃহধর্ম্ম করিতেছে এবং সে নীলকমলের ছেলে মেয়েদের বুকে পিঠে করিয়া মানুষ করিতেছে। উষাকে দেখিয়া রামচরণ কোনও-দিন ভাবে নাই, যে, সেই ফুটফুটে মেয়েটা কোন দিন নীলকমলের স্ত্রী হইতে পারে। আজ যতীনের মায়ের এই প্রস্তাবে হঠাৎ যেন তার চক্ষু খুলিয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল, তাহা হইলেত বেশ হয়। কিন্তু বাহিরে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিল না। বলিল, "ছেলেকে ত আপনি প্রতিদিনই

দেখিতেছেন। তাহার কথা আমি আর কি বলিব। আজ যদি কর্ত্তা বেঁচে থাকিতেন, তাহা হইলে ত ওরা রাজার হালে থাকিত। তা আগুণ কি ছাই দিয়ে ঢেকে রাখা যায়? এই ত এখন সে দিন কাটাইয়া তুলিয়াছে। এখন নীলকমল যে জলপানী পাইতেছে, তাতেই ওদের দুই ভাইএর খরচ চলিবে। কয়েক দিনের মধ্যে আমি নীলকমলের ছোট ভাইকে আনিতে যাইব, আপনি যদি বলেন, আমি মা ঠাকুরুণের কাছে এ কথা তুলিতে পারি।”

যতীনের মা বলিলেন, “তাহা হইলে ত বেশ সময়েই কথা উঠিয়াছে। নীলকমলের মা সম্মত হইবেন, মনে কর কি? তুমি তাঁকে মেয়ের কথা বেশ ভাল করে বলো। তুমিই বল, আমার মেয়ের কোনও দোষ ধরা যায় কি? যদি তুমি এই কাজটা করে দিতে পার, তাহা হইলে তুমি যা চাবে, তাই দিব। জানি, তুমি কিছুর প্রত্যাশা রাখ না। কিন্তু তুমি মনে করিলেই এ কাজটা হয়। আমি তোমার উপরই সব ভার রাখিতেছি।”

তিনি আরও অনেক কথা বলিলেন। নানা রকমে আভাস দিলেন, যে মেয়েকে অনেক গহনা পত্র দিবেন। রামচরণ ভারি খুসী হইয়া বাসায় ফিরিল। এখন তাহার নীলরতনকে আনিতে যাওয়ার তাড়াতাড়ি আরও বাড়িল। কয়েক দিনের মধ্যেই সে তাহার মনিবদের নিকট হইতে সাত দিনের ছুটী লইয়া বাড়ী গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

রামচরণের ঘটকালী।

অনেক দিন পরে রামচরণকে পাইয়া নীলকমলের মায়ের বড় আনন্দ হইল। সকাল সকাল তাহাকে চারিটি খাওয়াইয়া তিনি তাহার কাছে সকল সংবাদ শুনিতে বসিলেন। তাহারা কেমন করিয়া কৃষ্ণনগরে গিয়া এত দিন চালাইল, কি খায়, কষ্ট হয় কিনা ইত্যাদি। সে সকল কথার কি আর অন্ত

আছে ? রামচরণের অত বিলম্ব সহে না। একটা কথা বলিবার জন্য তাহার প্রাণ ছটফট করিতেছিল। সে আর দেরী না করিয়া বলিল, "আমি দুটা কাজের জন্য আসিয়াছি। একটা নীলরতনকে লইয়া যাইতে হইবে ; সে কথা পরে হইবে। আর একটা নীলকমলের বিয়ে।"

নীলকমলের মা ত একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সে কি বলিস্! কোথায় নীলকমলের বিয়ে? কে ঠিক করিল ?"

রামচরণ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না, না, বিয়ে ঠিক হয় নাই। কোথাও না। একটা কথা আছে ; কৃষ্ণনগরে এক জন মোক্তার আছেন। তাঁর ছেলের সঙ্গে নীলকমলের বড় ভাব, সে অনেক সময় তাদের বাড়ীতে থাকে, তাঁরা তাকে খুব যত্ন করে। তাদের একটী সুন্দর মেয়ে আছে। অমন মেয়ে আমি কোথায় দেখি নাই। তাঁরা লোকও খুব ভাল ; অনেক টাকা কড়ি আছে। বাড়ী আসিবার

আগে গিন্নি আমাকে একদিন ডাকিয়া এই বিবাহের কথা আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন। তাঁদের খুব ইচ্ছা, নীলকমলের সঙ্গে তাঁদের মেয়েটার বিবাহ হয়। এখন আপনি মত দিলেই হয়।”

মা বলিলেন,“নীলকমলের কি ইচ্ছা হইয়াছে ?”

রামচরণ। সে হয়ত জানেওনা। তবে তার মত না হবার ত কোনও কারণ দেখি না। সে মেয়েকে সে কতবার দেখিয়াছে। আপনি যদি সে মেয়ে দেখিতেন, নিশ্চয় এখনি মত দিতেন। আমাকে ফিরিয়া গিয়া উত্তর দিতে হইবে। কি ব'লব, বলুন।

নীলকমলের মা। তুমি বলিলে তাহারা বড় লোক।

রামচরণ। হাঁ, তাঁহারা বেশ বড় লোক, অনেক টাকা কড়ি আছে, বাড়ীতে অনেক চাকর বাকর খাটে।

নীলকমলের মা। দেখ চরণ, এখন আমাদের খুব বুঝিয়া চলিতে হইবে। আমাদের অবস্থা মন্দ

হইয়াছে। বড় লোকের মেয়ে এখন আমাদের বাড়ীতে আনিলে আমরা তাহাকে কি সুখে রাখিতে পারিব ? আর বড় লোক ও গরীব লোকের সম্বন্ধ সুখের হয় না। সমানে সমানে সম্বন্ধই ভাল। বড় লোক কুটুম্বেরা গরীব কুটুম্বের সম্মান করিতে পারেনা, অনেক সময় তাহাদের অনাদর করে। গরীবদের গরীবের মত থাকাই ভাল ; বড় লোকের দুয়ারে গিয়া অপমান কুড়াইতে কেন যাইব ?"

এই কথা শুনিয়া রামচরণ বেচারীর বুক যেন দশ হাত বসিয়া গেল। সে বলিল, "নীলকমল কি চিরকাল গরীব থাকিতে যাইতেছে ? কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে বড় লোক হইবে। তখন তারাই নীলকমলের কাছে মাথা হেঁট করিবার পথ পাইবে না।"

নীলকমলের মা। তা যখন হবে, তখন বিবাহেও কোন আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু এখন তাহাদের কাছে গেলেই আমাদিগকে ছোট হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। এখন তাড়াতাড়ি বিবাহের প্রয়োজনই

বা কি ? আমার ত এই মত। এখন তুমিও নীলকমল যাহা ভাল বুঝ, করিবে।

রামচরণ। তবেত সবই হইল। আপনি অমত করিলে দশগণ্ডা রামচরণ ও নীলকমলে কিছু হবে না আমি কি আর নীলকমলকে জানি না ? তবে আর হলনা।

নীলকমলের মা। চরণ তুমি দুঃখ কর কেন ? আমি ত বলিতেছি না, যে একেবারেই বিবাহ হইবে না। তুমি তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিতে পার। নীলকমলের লেখা পড়া শেষ হউক, চাকরী বাকরী করুক; বাড়ী ঘর দুয়ার আবার ভাল হউক, তখন গৌরবে ও সম্ভ্রমে বউ আনিবে। সেই কি ভাল নয় ?

রামচরণ যে সে যুক্তি বুঝিত না। তা নয়, তবে মেয়েটীকে তার এতই পছন্দ হইয়াছিল, যে আজ যদি বিবাহ হইয়া যায়, তবে তার আর কাল সহ্য হয় না।

যথাসময়ে রামচরণ নীলরতনকে লইয়া কৃষ্ণনগরে

ফিরিল। রামচরণ ফিরিতেই যতীনের মা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নীলকমলের মায়ের মত শুনিয়া তিনি বলিলেন "আমাদের অপেক্ষা করিতে কোনও আপত্তি নাই। বরং কিছু দিন পরে বিবাহ হয়, আমাদের পক্ষে তাই ভাল। ছেলে মেয়ের বয়স হইয়া বিবাহ হয়, আমাদের তাই পছন্দ, তবে আমাদের একটা আশ্বাস পাওয়া চাই। নীলকমলের মায়ের অমত নাই, আমি ধরিয়া হইলাম; কিন্তু নীলকমল কি বলে, তা কে জানে? ভাবগতিকে তাহারও মতটা জানিয়া আমাকে বলিবে।" রামচরণও নীলকমলের মনের ভাবটা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। কিছু দিনের মধ্যেই একটু অবসর বুঝিয়া রামচরণ আস্তে আস্তে নীলকমলকে এই বিবাহের কথা বলিল। নীলকমল বলিল, "যতদিন মাকে আমার সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে না পারিব, তত দিন বিবাহের কথা আমি মনে স্থান দিব না। আমার মা কি দুঃখে দিন কাটাইতেছেন, তাহা কি আমি জানি না? এখন কি আমার বিবাহ করিবার

সময় ?” রামচরণ এই মৃদু তিরস্কার বাক্যে লজ্জিত হইয়া বলিল, “আমি কি আর তোমাকে এখনি বিয়ে করিতে বলিতেছি ? বিবাহ পরেই হইবে। তবে ওঁরা একটু জানিতে চান, যে তুমি ওখানেই বিবাহ করিবে।”

এবার নীলকমল নিজেই লজ্জিত হইল। সে কিছু বলিতে পারিল না। বলিল, “ওসব কথা লইয়া আমাকে এখন বিরক্ত করিও না।” বাস্তবিকই নীলকমলের মনে এত দিন বিবাহের কোনও চিন্তাই আসে নাই। উষাকে সে অনেক বার দেখিয়াছে। নীলকমল স্বভাবতঃই লাজুক ; মেয়েদের কাছে বড় যাইত না। এখন হইতে একেবারে সেদিক পরিত্যাগ করিল। যতীনদের বাড়ীতে যাওয়া কমিয়া গেল, একেবারে বন্ধ করিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে আরও ধরা পড়িবে। কিন্তু যতীনদের বাড়ী গেলেও উষা যে দিকে থাকিত, তার ত্রিসীমাতে পদার্পণ করিত না।

নীলকমল যে পরিমাণে যতীনদের বাড়ী ছাড়িল,

সেই পরিমাণে সেখানে নীলরতনের পসার বৃদ্ধি হইল। যতীনের মা প্রায়ই নীলরতনকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। নীলরতন শীঘ্রই জানিতে পারিল, যে ওদের ঐ সুন্দর মেয়েটির সঙ্গে তাহার দাদার বিবাহের কথা হইতেছে। সে এই বিবাহের খুব পক্ষপাতী হইল। সুতরাং এই পরিবারের সঙ্গে সে মিশিতে চাহিত। ঊষার সঙ্গেও কথা বলিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত। কিন্তু ঊষা টের পাইয়াছিল, তাই নীলরতনকে দেখিয়া তাহার লজ্জা করিত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নীলকমলের চাকরী।

এত দিনে নীলকমল আর্থিক অভাব হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্ত হইয়াছে। তাহার বৃত্তি এবং রামচরণের বেতনে তাহাদের দুই ভায়ের খরচ চলিয়াও কিছু কিছু উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল। সেই

টাকা তাহারা প্রতি মাসে বাড়ী পাঠাইতে লাগিল। যত বয়স বাড়িতে লাগিল, নীলকমলের জ্ঞান পিপাসা ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার শিক্ষকগণ তাহার উন্নতি দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইতে লাগিলেন। এখন সে কলেজের অধ্যক্ষের সাক্ষাৎ অধীনে আসিয়াছে। তিনি নীলকমলের জ্ঞান-পিপাসা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শ্রমশীলতাতে এতই প্রীত হইয়াছিলেন, যে তাহাকে ছাত্র অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে বন্ধু ভাবে দেখিতেন। প্রায়ই নীলকমলকে আপনার বাড়ীতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন। নীলকমলও তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া অতিশয় উপকৃত হইত। ক্রমে নীলকমলের পাঠ্যা-বস্থা উত্তীর্ণ হইল। তাহার পরীক্ষার পর নীলকমল অনেক সময়েই কলেজের অধ্যক্ষের বাড়ীতে যাইত। এক দিন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন কি করিবে? তুমি যদি চাও ত, আমি, কমিসনারের নিকটে সুপারিশ চিঠি দিতে পারি, হয়ত তিনি তোমাকে ডিপুটী কলেক্টরের পদ দিতে

পারেন। কিন্তু তোমার তীক্ষ্ণ ধীশক্তি কেবল অর্থোপার্জ্জনে নষ্ট হয়, তাহা আমি চাহি না। ডিপুটী কলেক্‌টর হইলে তুমি আর সাহিত্য চর্চ্চা করিতে সময় পাইবে না।”

নীলকমল বলিল, “আমিও তাহা চাহি না। আমার ইচ্ছা, যে, আজীবন জ্ঞান চর্চ্চা ও সাহিত্য সেবাতেই জীবন যাপন করি। কিন্তু আমার উপর সমুদয় পরিবারের ভার। আমাকে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতেই হইবে। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শিক্ষা বিভাগে একটা সুবিধা মত কাজ দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিব।”

প্রিন্সিপাল নীলকমলের কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি বলিলেন, “তাহা অতি সহজেই হইতে পারিবে। তোমার পরীক্ষায় ফল বাহির হউক, আমি ডিরেক্‌টারকে লিখিয়া শিক্ষা বিভাগে প্রথম যে পদ খালি হইবে, তাহাই তোমাকে দেওয়াইব।” সে কালে শিক্ষাবিভাগের অবস্থা

আজ কালকার মত হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সহজে যে কোন বিভাগে কার্য্য পাইতেন। নীলকমল ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই ডেপুটী কলেক্‌টর হইতে পারিত এবং তাহাতে সে অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত। কিন্তু তাহার হৃদয়ে প্রবল জ্ঞান পিপাসা জাগিয়াছিল। যথা সময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, যে নীলকমল প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষের অনুরোধে শিক্ষা বিভাগের ডিরেকটর নীলকমলকে এক শত টাকা বেতনে একটী জেলা স্কুলের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। নীলকমল নীলরতন ও রামচরণকে লইয়া সেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। যতীনের মা এখন আবার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নীলকমল হাকিমী পদ গ্রহণ করিল না বলিয়া তিনি কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তবু তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যে এমন

পাত্র ছাড়া সুবিবেচনার কার্য্য নয়। বিশেষতঃ এখন যতীন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। সম্ভবতঃ ঊষারও এ বিষয়ে কিছু মত আছে। কেহ স্পষ্ট করিয়া তাহাকে কিছু না বলিলেও সে বুঝিতে পারিয়াছিল, যে তাহার মা বাপ নীলকমলের সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির করিতেছেন। সাধারণতঃ তখন মেয়েদের যে সময়ে বিবাহ হইত, ঊষার বয়স তাহা অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। তবু যে তার মা বাপ তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হন নাই, তাহাতে সে বুঝিয়াছিল, যে নীলকমলের সঙ্গে তাহার বিবাহই ঠিক। মা তাহার মনের এই ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং এত বিদ্যা শিখিয়াও নীলকমল যে হাকিম হইল না, সে জন্য তাঁহার মন না উঠিলেও তিনি নীলকমলের সঙ্গে ঊষার বিবাহ দেওয়ার সঙ্কল্পই ঠিক করিলেন। নীলকমল এখন কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। এখনি একটা পাকাপাকি কথা হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং আবার রামচরণের

উপর ডাক পড়িল। রামচরণকে এখন ঘন ঘন যতীনদের বাড়ী আসিতে হইতে লাগিল। রামচরণ নীলরতনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নীলকমলের মাকে পত্র লেখাইল। তিনি উত্তরে লিখিলেন, যে তাঁহার কোন অমত নাই, নীলকমলের মত হইলেই হইল।

এ দিকে নীলকমলেরও কৃষ্ণনগর ছাড়িবার দিন নিকট হইতে লাগিল। কৃষ্ণনগর ছাড়িতে তাহার বাস্তবিকই কষ্ট হইতেছে। যতীনের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের এমনি একটা যোগ হইয়াছিল, যে এখন পরস্পরকে ছাড়িবার চিন্তাতে ব্যথা পাইত। আর যদিও এদিকে নীলকমল তাহাদের বাড়ীতে বড় যাইতনা, তথাপি তাহাদের পরিবারের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা বৃদ্ধি হওয়া ভিন্ন হ্রাস হয় নাই। কৃষ্ণনগর হইতে চলিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া সে তাহার প্রাণের ভিতর কি এক প্রকার অব্যক্ত শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল। যত যাইবার দিন সন্নিকট হইতে লাগিল, তত সে পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন

ঘন যতীনদের বাড়ীতে আসিত। যাইবার দুই দিন পূর্ব্বে নীলকমল এক দিন অপরাহ্নে যতীনের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইতেছে, এমন সময়ে যতীনের মা আসিয়া বলিলেন, "বাবা নীলকমল, তুমিত চলিয়া যাইবে, আবার কত দিন তোমায় দেখিব না। যাবার আগে এক দিন আমার কাছে খাইয়া যাইবে না? তুমি আর এখন আমার কাছে এস না। কেন আমাকে কি পর করিয়া দিতেছ?"

নীলকমল লাজুকের একশেষ। কোনই উত্তর দিতে পারিল না। যতীনের মাও তাহাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া বলিলেন, "কাল তবে তুমি আমাদের এখানে খাইও। কাল আর কোথাও যাইতে পারিবে না। সমস্ত দিন আমার কাছে থাকিতে হইবে।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—ঃ০—

কৃষ্ণনগর ত্যাগ।

পর দিন নীলকমল প্রাতঃকালেই যতীনদের বাড়ী গেল। গাছের বীজ মাটী পাইলে শিকড় গাড়ে। তখন তাহাকে সেখান হইতে টানিয়া তোলা কঠিন। মানুষের হৃদয়ও তাহাই। তাহা হইতে সর্ব্বদাই শিকড় বাহির হয়। আমরা যে স্থানে দুই চারিদিনের জন্য থাকি, সেখানেই হৃদয়ের শিকড় গাড়িয়া যায়। যতীনদের পরিবারের সহিত নীলকমলের হৃদয়ের গাঢ় যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। বড় দুঃখের দিনে বিদেশে যখন তাহাদের মুখের দিকে স্নেহভরে তাকাইবার লোক ছিলনা, তখন তাহার অতি মিষ্ট ব্যবহারে কত দিন হৃদয়ের ভার লঘু করিয়াছে। আজ তাহাদিগকে ছাড়িতে হইবে। সুতরাং নীলকমলের হৃদয় যে অব্যক্ত বেদনা ভরে

পীড়িত হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? সে সমস্ত দিনই যতীনদের বাড়ীতে রহিল। সকলের হৃদয়ে বিষাদ, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা যতীনের প্রাণেই বেশী আঘাত লাগিয়াছে। সে সকল কাজের মধ্যে হৃদয়ে যেন পাষাণ ভার বহন করিয়া বেড়াইতেছে। সে আজ ছায়ার মত নীলকমলের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। তরুণ হৃদয়ের ভালবাসা বড় মিষ্ট পদার্থ। মানুষ বাহ্য জগতের নানা আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া অবাক হয়, কিন্তু আমরা যদি একটু স্থিরভাবে মানব হৃদয় রাজ্যের সামান্য সামান্য ঘটনা গুলি ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে অনেক বিস্ময়ের কারণ দেখিতে পাই। কৈশোর ও যৌবনে এক এক জনকে এমন গভীর ভাবে ভাল বাসিতে দেখা যায়, যাহা দেখিয়া মনে হয়, এই স্বার্থের সংসারে যেন স্বর্গ আসিয়া নামিয়াছে। তাহাদের ভালবাসাতে স্বার্থের গন্ধ মাত্রও নাই, তাহারা কেবল আপনাকে দিয়াই সন্তুষ্ট। যতীন নীলকমলকে এমনই ভালবাসিত। ক্রমে দিন

কাটিয়া গেল। যতীন সর্ব্বদা সঙ্গে রহিয়াছে বলিয়াই হউক, অথবা স্বাভাবিক লজ্জার জন্যই হউক, যতীনের মা নীলকমলকে যে কথা বলিবেন ভাবিয়াছিলেন, সে কথা তুলিবার অবসরই করিতে পারিলেন না। যখন শেষ অবসরও চলিয়া গেল, তখন তিনি রামচরণকে ডাকিয়া বলিলেন,যে তিনি ত নীলকমলকে কিছু বলিতে পারিলেননা, সে যেন পরে সুবিধা বুঝিয়া নীলকমলকে বলে, এখন ত নীলকমলের চাকরী হইয়াছে। বোধ হয়. আর তাহার কোন আপত্তি হইবে না। সারাদিন নীলকমলকে পাইয়াও যতীনের মা আসল কাজের কথাটী ঠিক করিয়া লইতে পারিলেন না, ইহাতে রামচরণ একটু বিরক্ত ও বিষণ্ণ হইল। সে বলিল, "আমার দ্বারা যাহা হইবার তাহা আমি নিশ্চয়ই করিব। কিন্তু এখানে থাকিতেই কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গেলে ভাল হইত। নীলকমল সময়ে সময়ে এমন মুর্ত্তি ধরে, তখন আমি কিছুই করিতে পারি না। যাহা হউক, এখন ত আর সময় নাই, পরে

দেখা যাইবে।” পর:দিন ভোরে উঠিয়া নীলকমল নীলরতন ও রামচরণকে লইয়া গরুর গাড়ীতে কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া চলিল। যতীন অনেক দূর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। চলিল। তার পর নীলকমল বলিল, “ভাই তুমি আর আসিও না, এখন ত আমাদের দূরে দূরে থাকিতে হইবে। জানিও, যেখানেই থাকি, তোমারও আমার মধ্যে কোন ব্যবধানই আসিতে পারিবে না।” অগত্যা যতীনকে ফিরিয়া যাইতে হইল। যখন দূরে কৃষ্ণনগর আকাশের কোলে ছায়ার মত মিলাইয়া [illegible] লাগিল, তখন নীলকমল রামচরণকে ডাকি[illegible] “চরণ দাদা, যেদিন বাবার মৃত্যুর পর [illegible] সঙ্গে কৃষ্ণনগরে আসিতেছিলাম, সেদিনের কথা তোমার মনে পড়ে?”

রামচরণ বলিল, “হাঁ পড়ে।”

আর কেহ কিছু বলিল না, দুই জনেই অতীত জীবনের সুখ দুঃখের চিন্তায় ডুবিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সুদিনে।

সেই দিন অপরাহ্নে তাহারা বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, নীলকমল অনেক দিন বাড়ী আসে নাই। বাড়ী হইয়া নূতন কর্ম্মস্থানে যাইবে এইরূপ ঠিক করিয়াছে। অনেক দিন পরে পুত্রদের নিকটে পাইয়া নীলকমলের মায়ের খুবই আনন্দ হইয়াছে; তবু তাঁহার সেই শান্ত, ধীর গম্ভীর মূর্ত্তিতে কোন পার্থক্য দেখা যাইতেছেনা। এতদিন পরে তাঁহার জীবনের ব্রত সাঙ্গ হইয়াছে। এখন সংসারে তাঁহার কামনার বস্তু আর কিছুই নাই। এক সূত্রে তিনি পৃথিবীর সঙ্গে বাঁধা ছিলেন, তাহা কোনও রূপে নীলকমলকে মানুষ করা, সে ব্রত এখন তাঁহার শেষ হইয়াছে। আজ তিনি অনুভব করিতেছিলেন, যে, তাঁহার অন্তরাত্মা মুক্ত পক্ষীর মত পাখা ছড়াইয়া বসিয়া আছে, একটু পরেই উড়িয়া যাইবে।

নীলকমলের চাকরী হইয়াছে, কর্ম্মস্থানে যাইবার পূর্ব্বে সে বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া গ্রামের লোক প্রায় সকলেই তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। সম্পদের দিনে সংসারে বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীর অভাব হয় না। আজ কত জন অযাচিত হইয়া আত্মীয়তা করিতেছে। নীলকমলের তাহা ভাল না লাগিলেও, সে সকলের সঙ্গেই শিষ্টভাবে আলাপ করিতেছে। রামচরণ কিন্তু রাগে গর গর করিতেছে। সে রুক্ষ স্বরে নালরতনকে বলিতেছে, "আজ বড় সকলে আত্মীয়তা করিতে আসিয়াছেন। এতদিন ত কাহারো মাথার টিকি দেখিতে পাওয়া যায় নাই।"

সকলের চেয়ে নীলকমলের খুড়ার আত্মীয়তাই বেশী। তিনি বার বার আসিয়া খোঁজ লইতেছেন, নীলকমলের খাওয়ার কি বন্দোবস্ত হইয়াছে, সহরে থাকা অভ্যাস, এখানে কষ্ট হবে, ইত্যাদি। নীল-কমলকে শীঘ্রই গিয়া কর্ম্মস্থান পৌঁছিতে হইবে। সুতরাং সে কেবল দুই তিন দিন বাড়ীতে থাকিতে পাইবে। মাকেও সঙ্গে লইতে নীলকমলের ইচ্ছা।

কিন্তু নূতন স্থান, আগে নিজে গিয়া সেখানে স্থির হইয়া বসিয়া পরে তাঁহাকে লইয়া যাইবে, সে এইরূপ প্রস্তাব করিতেছে। নীলকমলের মার কিন্তু আর কোথাও যাইতে তত ইচ্ছা নাই, তিনি গেলে বাড়ীতে কে থাকিবে? যাহা হউক, সে সব ভাবিবার সময় পরে হইবে, এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে। ইতিমধ্যে নীলকমলের মা বাড়ী মেরামত করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, অনেক দিন ভাল করিয়া বাড়ী মেরামত করা হয় না। কোনও রকমে কেবল দিন চালাইয়াছেন। এখন নীলকমল অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা পাঠাতে পারিবে, বলিয়াছে।

নীলকমলের বাড়ী আসার পরদিনেই তাঁহার খুড়া তাঁহাদিগকে আপনার বাড়ী আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। আহারান্তে তিনি নীলকমলকে বলিলেন "এখন ত বাবা, তুমি মানুষ হইয়াছ। আমরা কত আশা করিয়া আছি। ঐ বেহারীটার কিছু হইল না, আমার ত সাধ্য নাই যে, টাকা খরচ

করিয়া উহাকে বিদেশে রাখিয়া পড়াই। নীলরতন যেমন তোমার ভাই, ওকেও তেমনি মনে করিও। উহার যাহাতে একটা কূল কিনারা হয়, তাহাও তোমাকেই করিতে হইবে।"

বেহারী নীলকমলের খুড়ার ছেলে। নীলরতনের সমান বয়সই হইবে। গ্রামের স্কুলে যতদূর হয় পড়িয়াছে। তাহার পর আর কিছু করে না। নীলকমল ও তাহার খুড়াতে যখন এই প্রকার কথা হইতেছিল, রামচরণ তখন নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। কথা পড়িতেই সে নীলকমলের খুড়ার ভাব বুঝিতে পারিল। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। একেবারে নীলকমলের মায়ের কাছে আসিয়া বলিল, "আমিও তাই বলিতেছিলাম, এত আদর কেন? এখন সবাই ভাই হইতে আসিয়াছে। কিন্তু সেদিনের কথা বুঝি আমার মনে নাই? নীলকমল যদি মানুষ হয়, তবে আজ নিশ্চয়ই শুনাইয়া দিবে। অন্ততঃ আমি ত চুপ করিয়া থাকিব না।"

মা বলিলেন, "কি হইয়াছে চরণ ? তুমি কার কথা বলিতেছ ? আমি ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

রামচরণ বলিল, "আর কার? ও বাড়ীর কর্ত্তার। তাঁর হঠাৎ বড় মায়া জাগিয়া উঠিয়াছে। কেন জানেন ? এখন বেহারীকে মানুষ করিয়া দাও, সেওত তোমার ভাই। ইচ্ছা করিতেছিল, মুখের উপরে শুনাইয়া দিই, যে, যেদিন কর্ত্তা ছোট শিশু দুইটাকে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সেদিন আপনি ভাইয়ের কাজ কি করিয়াছিলেন ? যে দিন পাওনাদারেরা আসিয়া পিতৃহীন দুধের শিশুকে অপমান করিয়াছিল, সেদিনত মুখের একটা কথা দিয়াও সাহায্য করিতে পারেন নাই। আজ সুদিন আসিয়াছে, আজ ত সকলেই আপনার লোক।"

রামচরণ এইরূপ বলিতেছিল, ইতিমধ্যে নীলকমল ও নীলরতন উভয়েই আসিয়া জুটিয়াছে। নীলরতন রামচরণের কথায় বাতাসের আগে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "চরণ দাদা, তুমি ঠিক

বলিয়াছ। এখন বড় ভালমানুষী। কই এতদিন ত ডাকিয়া একটা কথা বলেন নাই। এই গ্রামে আমিত এই প্রথম নিমন্ত্রণ খাইলাম।"

নীলকমলের মা তাহাদিগকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ছি, অমন কথা বলিতে নাই। যে যেমন ব্যবহার করিয়াছে তাহা আমি সকলই জানি। সে সকলই আমার মনে গাঁথা রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা নীচ হইব? নীলকমল, তুমি তোমার কাকাকে কি উত্তর দিয়াছ?" নীলকমল বলিল, "আমি তোমায় জিজ্ঞাসা না করিয়া কোনও উত্তর দিতে পারি নাই। তবে বলিয়াছি, যে বেহারী ত আমার ভাইই। আমি যাহা পারি, তাহা অবশ্যই করিব।"

নীলকমলের মা বলিলেন, "তা বেশ করিয়াছ। তোমার মনে পড়ে, তিনি কত লোককে মানুষ করিয়াছিলেন? আমাদের যে তিনি অসহায় ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আমি দুঃখ করি নাই। তুমিও যদি পরের জন্য সর্ব্বস্ব দাও, আমি সন্তুষ্ট হই

অসন্তুষ্ট হইব না। আমি বলি, বেহারীকে সঙ্গে লইয়া যাও। সেখানে তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিও।" তাহাই ঠিক হইল। রামচরণ সমস্ত দিন রাগে গর গর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু কি করিবে? মায়ের কথার উপর কথা বলে, সে সাধ্য কাহারও নাই। যে কয়দিন নীলকমল বাড়ীতে রহিল, যে যেমন পারিল তাহার নিকটে স্বার্থ সাধন করিয়া লইল। কাহারও কাপড়, কাহারও পাঁচ টাকা, এই রূপে নানা জনে নানা দিক হইতে ফরমাইস করিল। নীলকমল সকলেরই জিনিস যথাসময়ে পাঠাইয়া দিবে, বলিল। কয়েক দিন বাড়ী থাকিয়া নীলকমল, রামচরণ নীলরতন ও বেহারীকে লইয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

বিদায়।

নূতন কর্ম্মস্থানে আসিয়া প্রথম কিছুদিন নীলকমলকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হইল। একটী স্কুলের ভার বুঝিয়া লওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। তাহার উপরে শিক্ষাকার্য্যে নীলকমলের এই প্রথম অভিজ্ঞতা। কলেজ হইতে বাহির হইয়া একটি উচ্চশ্রেণীর স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ সাধারণতঃ কাহাকে দেওয়া হয় না। কিন্তু নীলকমলের পরীক্ষার ফল অতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছিল। তাহার উপরে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ তাহার জন্য ডিরেক্টারের নিকটে বিশেষরূপে লিখিয়া-ছিলেন। যদিও নীলকমলের বুদ্ধি শক্তি অতীব তীক্ষ্ণ এবং ইংরাজী সাহিত্যে গভীর জ্ঞান, তথাপি শিক্ষকতা অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রথম প্রথম তাহাকে খুব খাটিতে হইত। অপরদিকে রামচরণও তাহার

কাজে খুবই ব্যস্ত। নূতন করিয়া ঘর সংসার সমস্তই পাতিতে হইতেছে ; সুতরাং প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাহার আর নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় হয় না।

এইরূপে কিছু দিন যাইতে না যাইতে একদিন প্রাতঃকালে বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল, যে, নীলকমলের মায়ের কঠিন জ্বর হইয়াছে। নীলকমল সেই দিনই বাড়ী যাইবার জন্য রওনা হইল। পথে কোথাও না থামিয়া নীলকমল যত শীঘ্র সম্ভব বাড়ী আসিল। আসিয়া দেখিল, যে তাহার মাতা শয্যাতে ছট ফট করিতেছেন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পথের দিকে চাহিতেছেন। নীলকমল আসিতেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাবা আসিয়াছ ?"

নীলকমল বলিল, "হাঁ মা আসিয়াছি।"

নীলকমলের মা বলিলেন, "আচ্ছা, আর কিছু চাহি না।"

নীলকমল তাহার মাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল যে তিনি চলিয়াছেন। প্রথম রোগের সংবাদ

পাইয়াই তাহার কেমন একটা বিশ্বাস হইয়াছিল, যে রোগ সাংঘাতিক। কে যেন তাহার কানে কানে বলিয়া গেল, যে তোমার মা বাঁচিবেন না। তাই কোথাও তিল মাত্র বিলম্ব না করিয়া নীলকমল বরাবর বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিল। নীলকমল মাতার শয্যাপাশে বসিতেই তাহার মা তাহার হাত খানি আপনার বুকের উপর তুলিয়া লইয়া চোখ বুজিলেন। ধীরে চক্ষুর কোণে এক ফোঁটা জল দেখা দিল। নীলকমলের চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। একটু পরে নীলকমলের মা চক্ষু খুলিয়া নীলকমলকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিলেন, "বাবা, কাঁদিতেছ কেন? আমার আর কোনও কষ্ট নাই। আমার জন্য কাঁদিওনা; এতদিন আমি যে জন্য ছিলাম, সে কাজ শেষ হইয়াছে। আর ত আমার কোনও কাজ নাই। এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে এখান হইতে প্রস্থান করিব। এ কয়দিন তোমাকে দেখিবার জন্য ছটফট করিতেছিলাম; এখন আমার আর কোনও যন্ত্রণা নাই। দেখ,

এখন আমি কেমন আরামে আছি, তুমি আমার জন্য কোন দুঃখ করিও না।”

মায়ের কথায় নীলকমলের অশ্রুধারা আরও প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। দৃঢ় চেষ্টাতেও সে প্রবল ধারা থামাইতে পারিল না; তখন মায়ের কষ্ট হইবে ভাবিয়া সে আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরে গেল। সেখানে অনেকক্ষণ খুব কাঁদিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিল, এবং মন প্রস্তুত করিয়া আবার আসিয়া মায়ের কাছে বসিল, নীলকমলের হাতে হাত রাখিয়া নিঃশব্দে নীলকমলের মাতার জীবন বায়ু বহিয়া গেল। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান কেহ টেরও পাইল না। তাঁহার প্রসন্ন ও গম্ভীর মূর্তির উপর যেন আরও প্রসন্নতর স্বর্গের ছায়া আসিয়া পড়িল। নীলকমল দীর্ঘ কাল তেমনি নিশ্চল ভাবে মায়ের হাত হাতে লইয়া বসিয়া রহিল। আজ আবার সমস্ত পুরাতন কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। বৈকালিক রৌদ্রে ছায়া যেমন দীর্ঘতর হয়, তেমনি আজ তাহার ক্ষুদ্র

জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস দীর্ঘতর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে যেন কতদিন, যে দিন বাল্যে পিতা তাহাদের ফেলিয়া গিয়াছিলেন। এত দিন এক সূত্রে জীবন আবদ্ধ ছিল। সকল কাজে এক চিন্তা উৎসাহ দিত, মা খুসী হইবেন, সকল বিপথে এক চিন্তা বাধা দিত, মা দুঃখিত হইবেন। আজ নীলকমলের নিকট জীবন অর্থশূন্য মনে হইতে লাগিল। এখন তবে আর কিসের জন্য বাঁচিব? আর ত মা নাই। এই কথা ভাবিতে তাহার নিকট পৃথিবী যেন শূন্য বোধ হইতে লাগিল। এখন আর নীলকমল কাঁদিতেছে না। যতক্ষণ মা জীবিত ছিলেন, চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতেছিল, কিন্তু এখন আর চক্ষে জল নাই। কেবল এক প্রকার শূন্য উদাস ভাব মেঘলার দিনের হাওয়ার মত হৃদয়কে অসাড় করিয়া দিতেছিল। আর কেহ নীলকমলকে কাঁদিতে দেখে নাই। কেবল শ্রাদ্ধের দিনে আচার্য্য যখন পড়িতেছিলেন,

গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাম্ মাতা পরমকোগুরুঃ,
মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।

তখন আর একবার দুই গণ্ড বহিয়া প্রবল জলধারা ছুটিতেছিল, সে ক্রন্দন দেখিয়া উপস্থিত সকলকেই কাঁদিতে হইয়াছিল।

খুব সমারোহের সহিত না হউক, প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্যে মাতার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া নীলকমল পুনরায় কর্ম্ম স্থানে গেল। রামচরণ ও নীলরতন সঙ্গে আসিয়াছিল। সকলেই এক সঙ্গে বাড়ী হইতে বাহির হইল। নীলকমলের স্বাভাবিক গম্ভীর মুখে গাঢ়তর গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িয়াছে। এই কয় দিনে নীলকমলের বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। নূতন কার্য্য প্রবৃত্ত হইয়াছে, এখন দীর্ঘকালের জন্য ছুটী পাওয়া সম্ভব নয়, তাই সে শীঘ্র কর্ম্ম স্থানে ফিরিয়া গেল। নীলকমল প্রতি দিন নিয়মিত কার্য্য করিয়া যায়, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই করে না। স্কুল হইতে আসিয়া আপন ঘরে অথবা ছাদে একাকী বসিয়া

থাকে। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তখন নীলরতন ও রামচরণ ভীত হইয়া উঠিল। এখন আর রামচরণও সাহস করিয়া বড় একটা নীলকমলের কাছে যায় না। একদিন স্কুলের পরে বাড়ী আসিয়া নীলকমল ছাদের উপরে একাকী বসিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় রামচরণ আস্তে আস্তে তাহার কাছে গিয়া বলিল, "তুমি অমন করিয়া দিন রাত্রি ভাব, তাহাতে আমাদের বড় ভয় করে। তুমি অমন করিলে চলিবে না।"

নীলকমল একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "ভয় কি, চরণ দাদা আমি ত কিছু করিতেছি না।"
রামচরণ। সেই ত ভয়; তুমি একবারে সব ছাড়িয়া দিলে। বেড়াও না, কাহারও সঙ্গে দেখা করনা, ঘর সংসারের দিকে মন দাও না।

নীলকমল। চরণ দাদা, ও সব আর আমার ভাল লাগে না। যাহা কিছু করিতাম, মাকে সুখী করিব বলিয়াই করিতাম। এত যে দুঃখ কষ্টের মধ্যে সংগ্রাম করিয়াছিলাম, তাহার মূলে একই

আকাঙ্ক্ষা ছিল, যে মাকে সুখী করিব। মা চলিয়া গিয়াছেন, এখন আমার জীবন যেন অর্থশূন্য হইয়া গিয়াছে। তাই একা একা বসিয়া থাকি।

রামচরণ। এমন করিলে চলিবে কেন। কাহারও মা ত চির দিন বাঁচিয়া থাকেন না। জীবনে ত আরও কত কাজ আছে।

নীলকমল। তাহা বুঝি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার জীবনে আর কোনও কাজ নাই। আমি মার জন্যই বাঁচিতাম। মা ও আমার মধ্যে এমন কোনও বিশেষ বন্ধন ছিল, যাহা ছিঁড়িয়া গিয়াছে বলিয়া আমার জীবনের সবই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

রামচরণ অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "দেখ, পৃথিবীতে আমার কেহই নাই। পিতা মাতার স্নেহ কেমন কখনও জানি নাই। তোমার বাবা দয়া করিয়া আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। শুধু আশ্রয় নহে, তাঁহার ভালবাসা পাইয়া আমি পৃথিবীতে কোন অভাবই বুঝি নাই।

আমার নিজের কিছুই নাই; তোমাদের সুখকেই নিজের সুখ করিয়া লইয়াছি। নিজের ভাই নাই, ঘর নাই, আত্মীয় স্বজন নাই, তোমরাই আমার সব। আমি আশা করিয়া আছি, যে বৃদ্ধ বয়সে তোমার ছেলে মেয়ের মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিব। বল, সংসারে আমার আর কি আছে?" রামচরণের কথাগুলি নীলকমলের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বিদ্ধ হইল। নীলকমল বলিল, "চরণদাদা, তুমি আমাদের জন্য যাহা করিয়াছি, সে ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। যে দিন তোমার নিঃস্বার্থ ভালবাসার কথা ভুলিব, সেদিন আমি নীচ ও অধম হইব। তুমি যদি আমাকে জল ও আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিতে বল, আমার মনে হয়, আমার তাহাও করা উচিত। তোমার জন্য আমি সকলই করিতে প্রস্তুত আছি।

রামচরণ। শুধু আমার জন্য নহে। যতীন বাবুর মা তোমার মুখ চাহিয়া এত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার কন্যাকে অবিবাহিত রাখিয়াছেন। এখন তাহাকে

নিরাশ করিতে পারা যায় না। তাহা হইলে তাঁহারা মহা বিপদে পড়িবেন।

নীলকমল। চরণ দাদা, আমি আর কিছু জানি না। আমি তোমার কথার বাধ্য হইব। কিন্তু তুমি আমাকে আরও কিছু সময় দাও। গৃহ সংসারের কথা ভাবিতে গেলেই মার কথা মনে পড়ে। মাকে ছাড়িয়া আমি সংসারের কোনও সুখের কথাই ভাবিতে পারি না।

রামচরণ সেদিন আর কোনও কথা বলিল না। তাহার নিকট সকল বিবরণ শুনিয়া নীলরতনও বড় আনন্দিত হইল।

পরিশিষ্ট।

প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। নীলকমল এখন আবার কৃষ্ণনগরে আসিয়াছেন। শিক্ষা কার্য্যে তাঁহার খুব যশ হইয়াছে। এখন তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। নদী তীরে একটি বাসা লইয়াছেন। অনেক সময় রামচরণকে একটি ছেলে ও একটী মেয়ে লইয়া নদীর তীরে বেড়াইতে দেখা যায়। নীলকমলের বাড়ীর সকলের উপর রামচরণের একাধিপত্য, কেবল ইহাদের নিকট তাহার পরাজয়। তাহারা কখনও তাহার ঘাড়ে চড়ে, কখনও তাহাকে ঘোড়া করিয়া পিঠে চড়ে। রামচরণের কিন্তু তাহাতেই আনন্দ।

সমাপ্ত।